স্তবকথামৃতম্
19317
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

সত্য কথা কলির তপস্যা। সত্যকে আঁট করে ধরে থাকলে ভগবান লাভ হয়।

●

সত্য বলছি (ঈশ্বর) দর্শন হয়। একথা কারেই বলছি, কেই বা বিশ্বাস করে !

●

ঈশ্বরকে দেখা যায়, আবার তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়, যেমন আমি তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

তব কথামৃতম্

(১)

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার
গোলপার্ক, কলিকাতা-২৯

প্রকাশক :
স্বামী তন্ময়ানন্দ
রামকৃষ্ণ মিশন
ইনস্টিটিউট অব কালচার
গোলপার্ক, কলিকাতা ৭০০০২৯

প্রথম সংস্করণ, আগস্ট ১৯৭৬
দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৭৬

প্রচ্ছদপট :
শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

মূল্য :
এক টাকা পঁচিশ পয়সা

মুদ্রক :
অরুণচন্দ্র মজুমদার
আভা প্রেস
৬বি গুড়িপাড়া রোড,
কলিকাতা-১৫

নিবেদন

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে প্রতি বুধবার 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথার এই ব্যাখ্যা ও আলোচনা শ্রোতাদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে, লক্ষ্য করেছি। অথচ অনেকে এই আলোচনা শোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। বিশেষ করে তাঁদেরই কথা স্মরণে রেখে কথামৃত-আলোচনার এই পুস্তিকা গত আগস্ট মাসে প্রকাশ করা হয়।

আমাদের অনবধানতায় প্রথম সংস্করণে কিছু ভুল থেকে গিয়েছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে সেগুলি সংশোধন করা হল। কয়েকজন হিতৈষী ভুলগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমাদের বাধিত করেছেন।

'তব কথামৃতম্' পুস্তিকার দ্বিতীয় পর্যায় শীঘ্রই প্রকাশ করার ইচ্ছা রইল।

প্রকাশক

সূচীপত্র

মন মুখ এক করতে হয়

শ্রীরামকৃষ্ণদেব অহংকার ত্যাগ করতে বলেছেন। বলেছেন যে, যতক্ষণ না অহংকার যাচ্ছে, ততক্ষণ ঈশ্বরদর্শন হয় না। অহংকার প্রসঙ্গে তাঁর একটি সুন্দর উপমা আছে। বলছেন : ধরো, একজনের বাড়িতে একটা উৎসব হচ্ছে। সেখানে কারও কোন জিনিসের দরকার। ভাঁড়ারে একজন আছে, তবু যদি লোকটি গৃহকর্তাকে সেই জিনিস বের করে দিতে বলে, তখন কর্তা কী করেন? তিনি বলেন : আমি আর কী করতে যাব ভাঁড়ারে, একজন তো সেখানে আছে! অর্থাৎ একজন যখন আছে, তখন আর কারও যাবার দরকার নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতে চাইছেন, আমরা আমাদের হৃদয়ের সিংহাসনে নিজেদের বসিয়ে রেখেছি, তাই ভগবান সেখানে আসতে পারছেন না। সেই যে রবীন্দ্রনাথের গানে আছে : 'দ্বার ভেঙে তুমি এসো মোর প্রাণে···'—তা দয়া করে তিনি যদি আসেন, যদি দরজা ঠেলে আসেন তিনি, তবে সে পরম ভাগ্যের কথা। কিন্তু আমরা যে আমাদের অহংকে সেখানে বসিয়ে রেখেছি!

ঠিক এই ভাব এক মুসলমান সাধক-কবি প্রকাশ করেছেন। একটি কবিতায় প্রথমে তিনি বলছেন :

'প্রীতম ছবি নৈনন বসী, পর ছবি কহাঁ সময়।' অর্থাৎ আমার যিনি প্রিয়তম, তাঁকে এই চোখে সর্বদা দেখতে পাচ্ছি, আর কাউকে তো দেখছি না। এই নয়নে যে তিনি বসে আছেন! শ্রীরাধিকা যখন চারিদিক কৃষ্ণময় দেখছিলেন, অবাক সখীরা তখন বলেন, কোথায় কৃষ্ণ, কৃষ্ণ তো এখানে কোথাও নেই! সেই কথা শুনে শ্রীমতী সখীদের নির্দেশ করেন, চোখে অনুরাগ-অঞ্জন দিয়ে দেখ।

অনুরাগ-অঞ্জন হল ভালবাসার কাজল। অনুরাগ-অঞ্জন যদি চোখে থাকে তাহলে তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়। এই মুসলমান সাধক-কবির চোখে রয়েছে সেই অঞ্জন। কবি পরে বলছেন ঃ

'ভরী সরায় রহীম লখি, আপ পথিক ফিরি জায়॥'

'ভরী সরায়' অর্থাৎ সরাইখানা লোকে ভর্তি ; সেই সময় রহীম এলেন সেখানে। যিনি কবি তাঁর নাম রহীম, আবার আরবী ভাষায় ঈশ্বরের নামও রহীম। কবি বলছেন ঃ রহীম অর্থাৎ ঈশ্বর সরাইখানা ভর্তি দেখলেন। তখন তিনি কী করবেন? পথিকবেশী ভগবান তখন হতাশ হয়ে ফিরে যান। ভগবান আমাদের হৃদয়ে আসতে চেষ্টা করছেন। আসতে গিয়ে দেখছেন, আমরা ইতিমধ্যে নিজেদেরই সেখানে বসিয়ে রেখেছি। তাঁকে তাই ফিরে যেতে হয়।

নয়নে তিনি বসে আছেন, ভক্তের এই অনুভূতি প্রসঙ্গে

একটি হিন্দী দোহা মনে পড়ে। শ্রীকৃষ্ণের কাছে গোপীদের সমর্পণের ভাবটি সেখানে সুপরিস্ফুট। দোহাটি এই ঃ

উধো, মন ন ভয় দস্ বীস্।

এক হুতো সো গয়ো শ্যাম সঙ্গ, কো আরাধৈ ঈস॥

উদ্ধবকে সম্বোধন করে গোপীরা এখানে বলছেন ঃ হে উদ্ধব, আমাদের তো দশ-বিশটা মন বা হৃদয় নেই, আছে মাত্র একটি। আর সেই মন চলে গিয়েছে শ্যামের সঙ্গে, শ্যামের কাছে। মনই যখন তিনি চুরি করে নিয়েছেন, তখন আর কেমন করে তাঁর আরাধনা করব? যে মন দিয়ে তাঁর চিন্তা করব, ধ্যান করব, সেই মনটি যে তাঁরই কাছে!

ভগবানের পাদপদ্মে ভক্তের সমর্পণ যেখানে এই রকম সম্পূর্ণ, সেখানে আনুষ্ঠানিক আরাধনার কি আর প্রয়োজন থাকে?

আজকের প্রধান আলোচ্য বিষয় যেটি, সেটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। সমস্ত গীতার সার কথা সেখানে আসছে। 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।'[১] অর্থাৎ তোমার ধর্মে তুমি স্থিত থাক, অন্যের অনুকরণ করতে যেয়ো না। কথাটা উঠল কিসে? হঠাৎ একটা গেরুয়াধারী ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘরে প্রবেশ করছেন। এক নজরে দেখে তিনি বুঝে নিয়েছেন, ইনি সত্যি সত্যি বৈরাগ্যবান সন্ন্যাসী

১। গীতা, ৩।৩৫॥

নন, এসেছেন গেরুয়া পরে, যেমন অনেকে মাঝে মাঝে খেয়াল-খুশি মতো গেরুয়া পরে।

সংসার ভাল লাগছে না, অতএব বৈরাগ্য! এ-রকম বৈরাগ্য আমরা অনেক দেখেছি। দেখা গিয়েছে, কোনও ছেলে হঠাৎ বেলুড় মঠে এল। বাড়িতে হয়তো পড়াশুনা করে না, বাবা-মা বকেছেন; অমনই বলছে, এ-সংসার আর ভাল লাগে না, কেউ আমার আপন-জন নেই, তাই আপনাদের কাছে এসেছি, সাধু হব। তা মঠে হয়তো থাকল এক বেলা, তার পর তাকে বলা হল, এই তো এক বেলা থাকা হল, এইবার ফিরে যাও, বাড়িতে সবাই চিন্তা করছেন। আর সে-ও সুড়সুড় করে চলে গেল। অধিকাংশ এই রকম।

তাই যিনি গেরুয়া পরে এসেছেন, তাঁকে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন: **আবার গেরুয়া কেন? একটা কি পরলেই হল? একজন বলেছিল, 'চণ্ডী ছেড়ে হলুম ঢাকী।'—আগে চণ্ডীর গান গাইতো, এখন ঢাক বাজায়!** তা বেশ তো চণ্ডীর গান গাইছিল, শেষে চণ্ডীর গান ছেড়ে কিনা ঢাক বাজাতে আরম্ভ করল! তারপর বলছেন: বৈরাগ্য তিন-চার প্রকারের আছে। হয়তো চাকরি-বাকরি নেই, গেরুয়া পরে কাশী চলে গেল। বাড়ির সকলে চিন্তা করছে, হঠাৎ চিঠি এল: ভেব না, চাকরি পেয়েছি,

কিছুদিনের মধ্যে আসছি। এ একরকম বৈরাগ্য। আবার কেউ বাড়িতে থেকেই ভগবানের জন্য একলা একলা কাঁদে—এই হচ্ছে যথার্থ বৈরাগ্য, সত্যিকার বৈরাগ্য।

এবার একটা কথা বলছেন, কথামৃত-তে সেটি বড় বড় হরফে লেখা আছে: **মিথ্যা কিছুই ভাল নয়।** শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন: ভান করতে নেই, নিজের ভাবটি ধরে থাক। কেন তুমি বৈরাগ্যের ভান করতে যাবে? তোমার সংসার আছে, সংসার ভাল লাগে, ভাল করে সেখানকার কর্তব্য কর। কোন বাধা-বিঘ্ন এল, অমনই এ-সংসার কিছু না, সংসার ছেড়ে চলে যাই! এভাবে যারা যায়, তাদের সংসার ত্যাগ সাময়িক, আবার তারা ফিরে আসে। তাই তিনি বলছেন: **মিথ্যা কিছুই ভাল নয়। মিথ্যা ভেক্ ভাল নয়।** 'ভিক্ষা' শব্দ থেকে 'ভৈক্ষ্য' এবং 'ভৈক্ষ্য' থেকে 'ভেখ' বা 'ভেক' কথাটি এসেছে। 'ভেক' মানে ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীর সাজ। 'মিথ্যা ভেক' বলতে ভণ্ডামি।

গেরুয়া সবার জন্য নয়, সবাই এপথে আসবে না। এই যে দেশে কত বেকার ছেলেমেয়ে, সকলেই কি সাধু হয়? হওয়া উচিতও নয়। সাধু হবে সে, যে বুঝেছে, এই আমার শ্রেষ্ঠ পথ, এই পথেই আমি যাব। চাকরি পেলেও সে তা ছেড়ে দিয়ে এই পথে যাবে। সংসারে কোনও আঘাত পায়নি, তবু যাবে। বৈরাগ্যের প্রকৃত

তাৎপর্য : ঈশ্বরকে আমি সবচেয়ে ভালবাসি, অন্য জিনিসের প্রতি আমার আকর্ষণ কম। চুম্বকের মধ্যে ছোট-বড় আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন : ঈশ্বর বড় চুম্বক, সবচেয়ে বড় চুম্বক। তিনি আমাকে টানছেন, তাই যাচ্ছি—এই হল বৈরাগ্য। শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বলছেন : বৈরাগ্য কী রকম জান? তুমি যেন তালগাছ থেকে লাফ দিয়ে পড়ছ, রক্ষা পাবে কিনা জান না। নিরুদ্দেশের পথে চলেছ।—যেমন ধরুন, ঘরবাড়ি ছেড়ে আমি যাচ্ছি, ঈশ্বরকে পাব কিনা জানি না, ভবিষ্যৎ অস্পষ্ট। রামকৃষ্ণ মঠে যাচ্ছি বটে, কিন্তু সেখানে থাকতে পারব কিনা তাও জানি না। তবু এমনই টান যে, সেখানে যাচ্ছি। বৈরাগ্য নেতিবাচক বস্তু নয়, সদর্থক। বৃহত্তর জিনিসকে, ভূমাকে লাভ করব বলে ক্ষুদ্র বস্তু বর্জন করছি। লোকে তীর্থস্থানে যায়। কত কষ্ট করতে হয় তার জন্য, তবু যায়। যায় ওই বড় জিনিসের টানে। ঈশ্বরীয় আনন্দ আস্বাদনের আশায়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ : ভাবের ঘরে চুরি করতে নেই, নিজের নিজের ভাব ত্যাগ করতে নেই। মন মুখ এক করতে হয়। আমার মন বলছে : অর্থ চাই, নামযশ চাই, ক্ষমতা চাই। বেশ তো! আমাদের শাস্ত্র তো কখনও বলছে না, এই সব কামনা অন্যায়। বলছে : তুমি এসব ভোগ কর, শুধু মনে রেখ, এসবের মাধ্যমে তুমি শান্তি পাবে

না। কিন্তু মনের যেটা স্বাভাবিক ধর্ম, সেদিকে তুমি নিশ্চয়ই যাবে। গীতায় ভগবান বলছেন, 'সহজং কর্ম কৌন্তেয়…।'[২] যা সহজ, সহজাত, তাকে অস্বীকার করা চলে না। খুবই বিজ্ঞানসম্মত কথা। শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন : যার পেটে যা সয়। ছোট্ট কথাটি, অথচ কী গভীর তার তাৎপর্য! সকলের জন্য এক মত, এক পথ হবে কেন? স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যদেশবাসীদের বলেছিলেন : তোমরা হিন্দু ধর্মের ভিতরের কথাটা বুঝতে পার না। এত দেবদেবী, এত বিভিন্ন মত, এই সব দেখে তোমরা ভাব, এ কী রকম ব্যাপার? আসল কথাটা এই, এক জামা কি সকলের গায়ে চড়ানো যায়? তোমরা তো সেই চেষ্টা করছ—এক জামা সকলের জন্য! তা হয় না, তাই বিভিন্ন মত ও পথের প্রয়োজন আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেই কথাই বলেছেন : যার পেটে যা সয়। একই পরিবারে আমরা সকলেই হিন্দু বটে, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গী আছে। পূজা, ধ্যান ইত্যাদি বিষয়ে নানা পদ্ধতি আছে, যার যেটি ভাল লাগে, সে সেটি গ্রহণ করবে। কারও উপরে জোর করে কিছু চাপানো ঠিক নয়। এই প্রসঙ্গে কাশীপুরের একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তখন অসুস্থ।

২। গীতা, ১৮।৪৮ ॥

শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানেরা তাঁর কাছে আছেন, সেবা করছেন। একদিন স্বামীজীর কী খেয়াল হল, তিনি কালী মহারাজকে (স্বামী অভেদানন্দ) পাশে বসিয়ে ধ্যান করতে আরম্ভ করলেন। স্বামীজী তাঁকে বললেন, আমার হাঁটুতে হাত রাখ্। এইভাবে কিছুক্ষণ ধ্যানের পর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী মনে হল তোর? কালী মহারাজ বললেন: একটা বৈদ্যুতিক শক্তি তোমার শরীর থেকে আমার শরীরে যেন ঢুকছে, এই রকম মনে হল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই কথা জানতে পেরে স্বামীজীকে ডেকে ভর্ৎসনা করলেন—জমতে না জমতেই খরচ? তাছাড়া ওর যা ভাব, তার বিরুদ্ধ ভাব কেন ওকে দিলি? ওর দ্বৈতভাব, তুই অদ্বৈতভাব কেন ওর মধ্যে ঢুকালি? বললেন, এ করতে নেই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কখনও তা করতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখা যায়, তিনি প্রত্যেককে আলাদা করে উপদেশ দিচ্ছেন। ফিসফিস করে কথা বলছেন। কেউ হয়তো জানতে চাইল, কী কথা হচ্ছে। তখন তিনি বলতেন: ও আমাদের মধ্যে একটা কথা হয়ে গেল, সে তোমরা বুঝবে না।

স্বভাব বুঝে শিক্ষা দিতে হয়। আজকাল বাপমায়েরা এটা ভুলে যান, ভুলে যান শিক্ষকেরাও। পাশ্চাত্য দেশে এখন তো গোড়াতেই ছেলেমেয়েদের মনস্তাত্ত্বিকদের

কাছে পাঠানো হয়। তাঁরা ওদের মনের গঠনটা বুঝে বলে দেন। তবে মুশকিল হচ্ছে, ওদের দেশে ওরা সুস্থ মানুষ দেখতে পায় না। এমনই অবস্থা যে, কেউ ধর্মের দিকে গেলে লোকে ভাবে, তার ব্যাধি হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রত্যেককে তার ভাব এবং প্রয়োজন বুঝে শিক্ষা দিতেন। স্বামীজী বলেছেন: তাঁর মতো শিক্ষক আমি দেখিনি, আদর্শ শিক্ষক আমাদের ঠাকুর। শ্রীশ্রীমায়েরও শিক্ষাদানের ধারা ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের মতো। শ্রীশ্রীমা বলতেন: যাকে যেমন তাকে তেমন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে বলছেন, ভান করতে নেই, এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর একটা চ্যালেনজিং স্টেটমেনট-এর উল্লেখ করব। স্বামীজী বলেছেন: দেখ, যীশুখ্রীষ্ট বলেছিলেন, কেউ যদি তোমার ডান গালে চড় মারে, তুমি তখনই তোমার বাঁ গালটা তার দিকে ফিরিয়ে দেবে। ইউরোপ কিন্তু কখনও তাঁর এই উপদেশ গ্রহণ করেনি। আর করেনি বলেই সে শক্তিশালী হয়েছে। তাঁর বলবার কথা এই যে, অত বড় আদর্শ গ্রহণ করা শক্ত। সকলে পারে না। গ্রহণ করলে মানতে হয়, নতুবা ব্যাপারটা ভণ্ডামির পর্যায়ে পড়ে। ইউরোপ সেই ভণ্ডামি করেনি।

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ বলেছিলেন: 'মেরেছ কলসীর

কানা, তাই বলে কি প্রেম দেব না?' তাঁরা যা পেরেছেন, সাধারণ মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। গান্ধীজী যখন দক্ষিণ আফরিকাতে ছিলেন, তখন সেখানে তাঁকে নানারকম নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। যেহেতু 'কালা আদমি', এই 'অপরাধে' তিনি বার বার অপমানিত হয়েছেন। প্রিটোরিয়া শহরে একদিন তিনি ফুটপাথ দিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময়ে সেখানকার এক রক্ষী হঠাৎ বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁকে ধাক্কা দিয়ে, লাথি মেরে ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নামিয়ে দিল। এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন গান্ধীজীর এক সাহেব-বন্ধু। মর্মাহত হয়ে তিনি গান্ধীজীকে আদালতে মামলা করতে বলেছিলেন। তিনি গান্ধীজীর পক্ষে সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন। গান্ধীজী কিন্তু রাজী হননি। তিনি তাঁর আক্রমণকারীকে অনায়াসে ক্ষমা করলেন। এখন, এই যে ক্ষমা, এ কি সাধারণ লোকে পারে? গান্ধীজী বলেছিলেন, সকলকে অহিংস হতে হবে। যাঁরা তাঁর সময়ের স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাস পড়েছেন, তাঁরা লক্ষ্য করে থাকবেন যে এক্ষেত্রে ব্যভিচার হয়েছে। ব্যাপারটা এই রকম: আমার মনে হিংসা রয়েছে, বাইরে সেটা প্রকাশ করতে পারছি না। আমি নিরস্ত্র; যদি প্রতিবাদ করি, তবে তার জন্য হয়তো আরও বেশী ভুগতে হবে। ভিতর ভিতর তখন জ্বলে

পুড়ে মরছি। অহিংসা মানে কি তা-ই? গান্ধীজীর বক্তব্য ছিল: আমাদের ঘৃণা ইংরাজদের প্রতি নয়, ইংরাজ শাসনের প্রতি। কী সূক্ষ্ম পার্থক্য! শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তিকে আলাদা করা যায় না। ঠিক তেমনই ইংরাজ শাসনকে ঘৃণা করলে সেই ঘৃণা ইংরাজ শাসকদেরও স্পর্শ করে—সেটা এড়ানো সম্ভব নয়, সম্ভব হতও না।

এইবার স্বামীজীর কথাটা ভাবুন। পাশ্চাত্য দেশ যীশুখ্রীষ্টকে পূজা করছে, কিন্তু তাঁর বাণী গ্রহণ করেনি। কোথায় সেই ক্ষমা, সেই উদারতা? সে তো কৃষ্ণকায় জগৎকে গায়ের জোরে দখল করে রেখেছিল। এশিয়া আর আফরিকাকে শোষণ করে সে ধনী হয়েছে। নিবেদিতা বলেছেন: ভারতবর্ষ, তুমি যখন ধ্যানে মগ্ন ছিলে, তখন একদল দস্যু তোমার ঘরে ঢুকে তোমার সর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিয়েছে।

স্বামীজীর আর একটি সাংঘাতিক উক্তি মনে পড়ে। তিনি বলেছেন, ভারতের অধঃপতন ঘটল যখন বুদ্ধদেব সকলকে জোর করে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করতে লাগলেন। সন্ন্যাস সকলের জন্য নয়, অহিংসাও সবার জন্য না। স্বামীজী তাই পরে বলেছেন: কেউ যদি তোমাকে এক চড় মারে, তাকে তুমি অন্তত পাঁচ চড় ফিরিয়ে দেবে। নয়তো

কাপুরুষতা হবে। গীতায় আমরা দেখি, ভগবান অর্জুনকে ক্ষাত্র ধর্ম মানতে বলছেন।

একটু আগে বলেছি, শ্রীশ্রীমা বলতেন : যাকে যেমন তাকে তেমন। তিনি দেখে শুনে মন্ত্র দিতেন। একদিন একজনকে এই রকম মন্ত্র দিয়ে বলেছেন : এই তোমার ইষ্টদেবতা, এই তোমার মন্ত্র। শিষ্য তো মন্ত্র নিয়ে চলে গিয়েছেন। কিন্তু এতদিন তিনি যেভাবে ঈশ্বরকে চিন্তা করে এসেছেন, শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশ তা থেকে কিছু স্বতন্ত্র। তিনি অস্বস্তি বোধ করছেন। মাকে চিঠি লিখে জানালেন : মা আপনি আমাকে এই মন্ত্র দিয়েছেন, বলেছেন, ইনি আমার ইষ্টদেবতা, কিন্তু আমার তো ভাল লাগছে না, আমি অন্যভাবে ঈশ্বরকে চিন্তা করে এসেছি। আপনি যদি আমার মন্ত্রটা বদলে দেন। শ্রীশ্রীমা অনেক চিন্তা করে জানালেন : না বাবা, আমি যা দিয়েছি, ঠিকই দিয়েছি। তুমি ওইটে ধরে থাক। যাঁকে জানাচ্ছেন, তিনি একজন সাধু। পরে সেই সাধু বলেন : আমি প্রথমে আনন্দ পাচ্ছিলাম না ; শেষে বুঝেছি, ওইটিই আমার ঠিক মন্ত্র, সাধনের ঠিক পথ।

বলছিলাম, গীতার উপদেশের কথা। যুদ্ধ আরম্ভ হবে কুরুক্ষেত্রে। উভয় পক্ষ প্রস্তুত। অর্জুন রথ চালিয়ে সব দেখলেন। দেখে শুনে হঠাৎ বৈরাগ্যের উদ্রেক হল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তিনি বললেন : আমি কাদের মারতে যাচ্ছি? এরা যে সব আমার আত্মীয়, ভাই!

…যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ ॥[৩]

—ধৃতরাষ্ট্রের সন্তান, আমার ভাই, তারাই আমার সামনে উপস্থিত ; এদের মেরে আমি বাঁচতে চাই না।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥[৪]

—নিজের উপর আস্থা নেই, যুদ্ধ করব যে, সেই শক্তি পাচ্ছি না, তাই হে কৃষ্ণ, তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করছি। আমি সংমূঢ়, বিমূঢ় ; দয়া করে আমাকে উপদেশ দাও, বল, কোন্‌টা শ্রেয় পথ, কী আমার কর্তব্য। আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাগত ; তুমি আমাকে শাসন কর, পরিচালনা কর।

শ্রীকৃষ্ণ উত্তরে বললেন :

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥[৫]

—তুমি বিজ্ঞের মতো কথা বলছ, অথচ যেখানে শোক

৩। গীতা, ২।৬। ৪। গীতা, ২।৭। ৫। গীতা, ২।১১।

করবার কথা নয়, সেখানে শোক করছ; জ্ঞানীরা তা করেন না।

তারপর তিনি বলছেন ঃ

…ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥৬

—ধর্মযুদ্ধ ছাড়া ক্ষত্রিয়ের অন্য কোনও ধর্ম, আর কিছু মঙ্গলকর নেই। অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে ঃ ধর্মকে, সত্যকে, সমাজকে রক্ষা করার দায়িত্ব ক্ষত্রিয়ের।

অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।

ততঃ স্বধর্মং কীর্তিং চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥৭

—যদি তুমি এই ধর্মযুদ্ধ না কর, তা হলে তুমি তোমার নিজের ধর্ম (ক্ষাত্রধর্ম) থেকে পতিত হবে; তোমার গৌরব নষ্ট হবে, পাপ হবে।

আমরা যীশুখ্রীষ্টকে সম্মান করি, সব হিন্দুই করে, আবার রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনে বিশেষ করেই তাঁর জন্য শ্রদ্ধার আসন পাতা। একবার এখানে চব্বিশে ডিসেমবর একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হচ্ছে। খ্রীষ্টভক্ত এক পাদ্রী সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত। কথায় কথায় তাঁকে বলেছি, আমরা সব ধর্মকে শ্রদ্ধা করি। তিনি বললেন, কিন্তু সব ধর্মকে তো সমান বলা যায় না! বললাম ঃ সবার কাছে সমান নয়। আমার কাছে আমার ধর্মই ঠিক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব

৬। গীতা, ২।৩১ ॥ ৭। গীতা, ২।৩৩।

ধর্ম সেই একই জায়গায়, ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে দেয়। তখন তিনি বলছেন ঃ কোনও ধর্ম বলে, তোমার এক গালে কেউ চড় মারলে তাকে আর এক গাল ফিরিয়ে দাও; আর কোনও ধর্ম বলে, তোমার ভাইকে হত্যা করে সিংহাসন কেড়ে নাও। তা হলে দুই ধর্ম কি সমান হল? —তিনি অবাক হয়ে গিয়েছেন। স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে রুড়কি বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম। তখন মোরারজী দেশাই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। আমরা দুজনে বক্তা। যেই আমি স্বামীজীর সেই এক চড়ের জবাবে পাঁচ চড় ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশের কথা বলেছি, অমনই মোরারজী দেশাই চমকে উঠলেন। মোরারজী দেশাইয়ের ধারণা, স্বামীজী একথা বলতেই পারেন না। আমি জোর দিয়ে বললাম, হ্যাঁ, তিনি বলেছেন। এই নির্দেশ সংসারীদের জন্য। ওঁরা গান্ধীজীর অহিংসা-বাণী শুনতে অভ্যস্ত। স্বামীজীর প্রতি মোরারজী দেশাইয়ের শ্রদ্ধা অবশ্যই অপরিসীম, কিন্তু স্বামীজীর পক্ষে ওই রকম উক্তি সম্ভব, এটা তিনি কিছুতেই মানতে পারছিলেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। একবার দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঘরে একটি আরশোলা পাওয়া গিয়েছে। তিনি স্বামী যোগানন্দকে সেটি মেরে ফেলতে বলেছেন। স্বামী যোগানন্দ ভাবছেন, মেরে ফেলতে

বলেছেন বটে, সেটা নিশ্চয় তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তিনি আরশোলাটা বাইরে ছেড়ে দিয়ে এসেছেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, মেরে ফেলেছিস তো? ছেড়ে দেওয়ার কথা শুনে ঠাকুর অসন্তুষ্ট হলেন। বললেন: তোকে যা বলেছিলাম, তা-ই করা উচিত ছিল।

আমাদের আত্মরক্ষার জন্য, স্বাস্থ্যের জন্য যা দরকার, তা করায় কোন দোষ হয় না। ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্ম খুব প্রবল। সবাই বৌদ্ধ। কিন্তু সেখানকার লোকেরা মাছ মাংস খায়। বাজারে গিয়ে মরা মাছ যদি পচা মনে হয়, তবে জ্যান্ত মাছ কেনে। কিনে বিক্রেতাকে বলে, মাছটা তুমি মেরে দাও। এই বলে মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে রাখে। একে কি অহিংসা বলে? বস্তুত, অহিংসা সকলের জন্য নয়।

ঠাকুর ফোঁস করার কথা বলেছেন। দরকার হলে সাধুও ফোঁস করবেন। স্বামীজী একবার ট্রেনে যাচ্ছেন, প্রথম শ্রেণীর কামরায়—তখনও বিদেশে যাননি। কামরায় দুটি সাহেব। তারা বলাবলি করছে, লোকটি কে? একজন মাথা খাটিয়ে বলল, কে জান? দিনের বেলা এ সাধু সেজে বেড়ায়, আর খোঁজ নেয় কার বাড়িতে কী আছে, রাত্রে গিয়ে সেগুলি চুরি করে। ইতিমধ্যে এক জায়গায় এক রেল-কর্মচারীর সঙ্গে স্বামীজী

ইংরাজীতে কিছু কথা বলেছেন। ওরা দেখছে, তাই তো ইনি ইংরাজী জানেন। স্বামীজীকে তখন একজন বলছে, একটু আগে আমরা যা আলোচনা করছিলাম, আপনি কি তা শুনেছেন? স্বামীজী বললেন, শুনেছি বই কি! ওরা অবাক হয়ে বলল, কই আপনি তো কোনও প্রতিবাদ করলেন না! এবার স্বামীজী মুখ খুললেন: দেখুন, রাস্তা দিয়ে যখন যাই, আহাম্মকরা কত কী বলে, তা বলে কি আমিও ওদের মতো কিছু বলব?

আর একবার দুজন পাদরি জাহাজে স্বামীজীর সামনে ভারতবর্ষের নিন্দা করছিল সমানে। স্বামীজী প্রথমে ওদের বোঝানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু জেগে-ঘুমোনো লোককে তো আর জাগানো যায় না! শেষে স্বামীজী একজনের জামার কলার চেপে ধরে বললেন: দেখ, আমার দেশ সম্বন্ধে আর একটি খারাপ কথা বলেছ তো, তুলে সমুদ্রের মধ্যে ফেলে দেব। সাবধান!—এই ওষুধে কাজ হল।

স্বামী নিরঞ্জনানন্দ একবার নৌকায় দক্ষিণেশ্বর আসছেন। ভাড়াটে নৌকা, অনেক যাত্রী। একদল লোক সেখানে ঠাকুরের নিন্দা করছে। নিরঞ্জন মহারাজ প্রথমে প্রতিবাদ করলেন। তারা কর্ণপাত না করে বিরূপ মন্তব্য করে চলেছে। তখন তিনি বললেন:

তবে রে, নৌকো ডুবিয়ে দেব, সবাইকে ডুবিয়ে মারব। এই বলে নৌকা দোলাতে আরম্ভ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা হাতজোড় করে ক্ষমা চায়। এই ঘটনা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন ঃ রাগ না চণ্ডাল! ছি ছি, এমন রাগ করতে আছে? ক্রোধের বশে কী অন্যায় করতে যাচ্ছিলি ভাব দেখি—দাঁড়িমাঝিরা তোর কী অপরাধ করেছিল যে, সেই গরিবদের উপরও অত্যাচার করতে গিয়েছিলি! —কিন্তু আবার একই ধরনের ঘটনায় শান্ত প্রকৃতির যোগেন মহারাজ প্রতিবাদ করতে পারেননি জেনে বলেছেন ঃ সে কী, তোর সামনে গুরুনিন্দা হল, আর তুই চুপ করে রইলি, প্রতিবাদও করলি না? যাঁকে যেমন দরকার, শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে তেমন উপদেশ দিয়েছেন। একজনকে বলছেন ঃ ক্রোধ সংবরণ কর; আর একজনকে বলছেন ঃ তুমি শান্ত প্রকৃতির বটে, তবু এ-সময়ে প্রতিবাদ করতে হয়।

হিংসা-অহিংসা সম্বন্ধে আমাদের অনেক ভুল ধারণা আছে। পাণ্ডবদের কথা ধরা যাক। তাঁদের উপর উৎপীড়ন হয়েছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাঁরা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালন করেছেন। সন্ন্যাসীর ধর্ম আলাদা। সাধুও প্রয়োজনে ফোঁস করতে পারেন, কিন্তু তিনি অপরের অনিষ্ট করবেন না। শ্রীশ্রীঠাকুরকে একবার একজন

—হালদার পুরোহিত—পদাঘাত করে। মথুরবাবুর পুরোহিত বংশজাত এই ব্যক্তির হিংসার কারণ, শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি মথুরবাবুর বিশেষ আনুগত্য ও ভক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন সমাধি-অবস্থায় আছেন, সামান্য একটু বাহ্য জ্ঞান আছে, সেই সময়ে লোকটি এসে তাঁকে লাথি মারল। তিনি দেখছেন, তবু কিছু বলছেন না। যদি মথুরবাবুকে বলে দিতেন, তা হলে তিনি ওর মাথা কেটে ফেলতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আঘাত এবং অপমান সহ্য করলেন, ওকে ক্ষমা করলেন। এ ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসীর ধর্ম। সর্বভূতে প্রেম কখন? যখন আমি সর্বত্র ব্রহ্ম দর্শন করছি, তখন। কাকে তখন আঘাত করব? নিজেকে আঘাত করি কেমন করে? এক ব্রহ্মই যে সকলের মধ্যে। এই ঐক্যবোধ যখন আসে, তখনই প্রকৃতপক্ষে অহিংস হওয়া যায়। নতুবা ভণ্ডামি হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব মন মুখ এক করতে বলতেন। কোনও রকম মিথ্যাচার তিনি সমর্থন করতেন না। কর্ণের জীবনে একটি মিথ্যাচারের কী পরিণতি দেখুন। কর্ণ ক্ষত্রিয়, অস্ত্রবিদ্যা শিখতে গেলেন পরশুরামের কাছে, দ্রোণাচার্য তো শেখালেন না। পরশুরামের কাছে তিনি ব্রাহ্মণ-তনয় বলে পরিচয় দিলেন। শিক্ষা চলতে থাকল। একদিন ক্লান্ত পরশুরাম কর্ণের জানুতে মাথা রেখে বিশ্রাম করছেন,

ইতিমধ্যে একটি পোকা কর্ণের জানু ভেদ করে উঠেছে। তিনি যদি হাঁটু নাড়ান, তা হলে গুরুর বিশ্রামের ব্যাঘাত হয়, তাই স্থির হয়ে মুখ বুজে কষ্ট সহ্য করেছেন। পরশুরাম ঘুম থেকে উঠে রক্ত দেখলেন, রক্তপাতের কারণ কী, তা-ও জানতে পারলেন। তখন তিনি শিষ্যকে বললেন : তুমি কখনও ব্রাহ্মণ নও, এত সহ্যশক্তি একমাত্র ক্ষত্রিয়ের পক্ষেই সম্ভব। কর্ণ নিজের প্রকৃত পরিচয় দিলেন। ছলনায় রুষ্ট হয়ে পরশুরাম কর্ণকে অভিশাপ দিয়ে বললেন : যে অস্ত্রবিদ্যা আমার কাছে শিখেছ, বিপদের সময় সেসব তুমি ভুলে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন : যারা সৎ, অভিনয়েও তাদের মিথ্যা বলতে নেই। দক্ষিণেশ্বরে রাখাল মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) মুখের দিকে তাকিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন বললেন : তোর মুখটা মলিন দেখছি কেন, কিছু অন্যায় করেছিস? স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রথমে বুঝতে পারেননি, পরে ভেবে বললেন : হ্যাঁ, ঠাট্টাচ্ছলে একটা মিথ্যা বলেছি। শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে বললেন : না, তা-ও বলবি না। যে সাধু হবে, সে ঠাট্টাচ্ছলেও মিথ্যা উচ্চারণ করবে না।

কেশব সেনের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'নব-বৃন্দাবন' নাটক দেখতে গিয়েছিলেন। বলছেন : একজন দেখি, মাতাল সেজে মাতলামি করছে। নাটকটি ধর্ম-সমন্বয়ের। তার মানে : খ্রীষ্টান ধর্মের খানিকটা, কিছু ইসলাম ধর্মের আর কিছু হিন্দু ধর্মের জিনিস নিয়ে একটি সংযোজন। নাটকটি মনে হয় তাঁর তেমন ভাল লাগেনি। সেখানে ওই মাতলামির অভিনয় দেখে তিনি বলছেন : ভক্ত মাতাল সাজবে না। ওই সব বিষয়ে মন অনেকক্ষণ ফেলে রাখলে ক্ষতি হয়। কথাটি অত্যন্ত মূল্যবান। তিনি বলছেন : মন একটা কাপড়ের মতো। ধোপার ভাঁটিতে নানা রঙ থাকে। যে রঙের জলে কাপড় ডোবানো হয়, সেই রঙ কাপড়ে ধরে যায়। তেমনই আমরা যে বিষয় নিয়ে চিন্তা করি, আমাদের মনেও তার ছাপ লাগে। ঈশ্বরের চিন্তা নিয়ে যদি থাকি, তবে দেখব, মন পবিত্র হচ্ছে, সুন্দর হচ্ছে, আমি ক্রমে আনন্দে মগ্ন হচ্ছি। বিষয়ের চিন্তা নিয়ে থাকলে মন কেবল বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হবে। গীতায়[৮] এই কথা আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাই বলছেন : মোড় ঘুরিয়ে দাও। বিষয়ভাবনা থেকে সরিয়ে মনকে ঈশ্বরের দিকে চালিত কর। মীরাবাঈয়ের একটি গানে আছে :

হরিষে লাগি রহো রে ভাই।
তেরা বনত বনত বনি যাই তেরা বিগড়ি বাত বনি যাই ॥[৯]

তাঁর নাম নিয়ে লেগে থাকলে ক্রমে মন তাঁর কাছে পৌঁছে যাবে। ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ যাঁদের ভাল লাগে, বিষয়ের

৮। গীতা, ২।৬২ ॥
৯। দিব্যগীতি (স্বামী অপূর্বানন্দ সংকলিত), পৃঃ ১[illegible]

কথায় তাঁদের বিরক্তি আসে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেনঃ ঈশ্বরের রঙে মনকে রাঙিয়ে নাও, দেখবে এতে কত আনন্দ, কত তৃপ্তি। আনন্দ কত রকম! স্থূল, সূক্ষ্ম নানা সুখকর অনুভূতি রয়েছে। সূক্ষ্মতম, গভীরতম আনন্দ ধ্যানের আনন্দ, ঈশ্বর-সান্নিধ্যের আনন্দ, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের আনন্দ। কেননা সমস্ত আনন্দের উৎস যে ঈশ্বর! 'রসো বৈ সঃ'[১০]—তিনি রস স্বরূপ। সেই রসের আস্বাদ পেলে আর কিছু ভাল লাগে না। ঈশ্বরচিন্তার আনন্দ, তাঁর নামগানের আনন্দ, তাঁর প্রিয়জন অর্থাৎ ভক্তজনের সঙ্গলাভের আনন্দ—এ সবের তুলনা নেই। তীর্থস্থানে দেখেছি, যাত্রীরা খালি পায়ে চলেছে, কত শারীরিক কষ্ট ভোগ করছে, তবু চলেছে প্রসন্ন চিত্তে। ওদের আনন্দের কাছে সব কষ্ট তুচ্ছ। যে সেই আনন্দের স্বাদ পায়নি, তাকে এ বিষয়ে বুঝিয়ে বলা শক্ত। কেউ কেউ হয়তো বলে বসবে, লোকগুলি মূর্খ। কিন্তু মূর্খ কে, তারা কি জানে? সেই এক গল্প আছে। একজন খুব গরিব। ভগবানের কাছে কাতর হয়ে প্রার্থনা করছে, আমার দারিদ্র্য দূর কর। প্রার্থনায় তুষ্ট, ভগবান বিষ্ণু সেই লোকটির আসার পথে একখণ্ড হীরক ফেলে রাখলেন। লোকটি চোখ চেয়ে হাঁটলে সেই মূল্যবান বস্তুটি পেয়ে যেত

১০। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।৭॥

কিন্তু হীরকখণ্ডের কাছাকাছি এসে হঠাৎ খেয়ালের বশে লোকটি চোখ বন্ধ করে হাঁটতে আরম্ভ করল। অন্ধরা পথে কেমন করে চলে, তার সেই পরীক্ষা করে দেখবার ইচ্ছা হয়েছিল। নিজের নির্বুদ্ধিতায় সে হীরকখণ্ডটি দেখতে পেল না।

আমরা কি ওই লোকটিরই মতো চোখ বন্ধ করে থাকি না? অমৃত সামনে, তবু আমরা তা নিতে পারি না। ঈশ্বর সেই অমৃতস্বরূপ। তাঁকে নিয়ে যে আনন্দ, তা অপরিচ্ছিন্ন, নিরবচ্ছিন্ন। এর সঙ্গে দুঃখের লেশ যুক্ত থাকে না। অন্য সব রকম আনন্দের সঙ্গে দুঃখ মেশানো আছে। এ আনন্দ নির্বিশেষ। ঈশ্বরের নামগানের স্বাদ যে পেয়েছে, সে-ই জানে এই রসের বিশেষত্ব। একজন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, সমাধি অবস্থায় কী হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেনঃ কেমন করে বুঝিয়ে বলি। এ কি বুঝিয়ে বলার বিষয়? যে চিনি খেয়েছে, সে-ই জানে তার স্বাদ কেমন। অপরকে কি বুঝিয়ে বলা যায়?

[২৪.৩.৭৬]

[আলোচিত অংশঃ **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, প্রথম ভাগ** (১৮৮৩, ২৯শে মার্চ), পঞ্চম খণ্ড দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ; পৃঃ ৮৪ ॥]

নিত্যসিদ্ধ একটি থাক আলাদা

ঈশ্বরলাভের পথে অহংকার একটা বড় অন্তরায়—এই কথাটি শ্রীশ্রীঠাকুর বার বার বলেছেন। অহংকার যে ভ্রমাত্মক, এটা আমরা বুঝেও বুঝি না। এই প্রসঙ্গে ডকটর পি সি ঘোষ (পশ্চিম বঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী) সেদিন একটি গুজরাটী কবিতার দুটি কলি শোনালেন। কলি দুটি এই :

হুঁ করুঁ হুঁ করুঁ এ জ অজ্ঞানতা।
শকটনো ভার জেম শ্বান তানে॥

—অর্থাৎ আমি করি, আমি করি এটা অজ্ঞানতা। গরুর গাড়ির নীচে গাড়ির ছায়ায় ছায়ায় যে কুকুর পথ চলে, সে ভাবে সে-ই গাড়ির ভার টানছে। আমাদের অজ্ঞানতা-জনিত অহংকার এই রকমই।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বহুপরিচিত ছোট কবিতাটিও স্মরণ করা যেতে পারে :

রথযাত্রা, লোকারণ্য, মহাধুমধাম—
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।

পথ ভাবে 'আমি দেব', রথ ভাবে 'আমি',
মূর্তি ভাবে 'আমি দেব', হাসে অন্তর্যামী॥

কথামৃতের যে অংশ আজ আমরা আলোচনা করব, সেখানে নরেন্দ্র প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ ভক্তদের কথা আছে। স্বামীজী যেদিন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে গেলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর সেদিন তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে স্তব করেছিলেন। বলেছিলেন : তুমি জান না, তুমি কে। আমি জানি। নররূপী নারায়ণ তুমি। এসেছ লোককল্যাণের জন্য।

স্বামীজী ঠাকুরের কাছে সমাধিলাভের ইচ্ছা জানিয়েছিলেন। সর্বক্ষণ সমাধিতে মগ্ন হয়ে থাকবেন, এই তাঁর ইচ্ছা। শুনে ঠাকুর বলেছিলেন : ছি. তোর এত হীন বুদ্ধি। তুই হবি একটা বিশাল বট গাছের মতো। লোকে তোর কাছে এসে ছায়া পাবে, আশ্রয় পাবে, শান্তি পাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন, নরেন্দ্র প্রভৃতি ওরা নিত্যসিদ্ধ। 'নিত্যসিদ্ধ' কাকে বলে? যাঁরা ভগবানের অবতারের সঙ্গে আসেন, তাঁরা নিত্যসিদ্ধ। অবতার আসেন, সঙ্গে আসেন তাঁর নিজস্ব একদল মানুষ। শ্রীশ্রীঠাকুর বাউলের দলের সঙ্গে এঁদের তুলনা করেছেন। হঠাৎ যেন একদল বাউল এল ; গান গাইল, নাচল, লোককে আনন্দ দিল ; তারপর চলে গেল। কোথাকার লোক এরা, কেউ খবর রাখে না। বাউল কিনা! বাউলদের ঘরবাড়ি, সমাজ,

গোত্রপরিচয়, এসব কিছুই থাকে না। ঠাকুরের পার্ষদ যাঁরা, তাঁরা নিত্যসিদ্ধ। তিনি কাউকে যীশুখ্রীষ্টের সঙ্গে দেখেছেন, বলেছেন। কাউকে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে। অর্থাৎ এঁরা বার বার অবতারের সঙ্গে আসেন। এমনিতে সাধারণ মানুষের মতো, এঁরা কেউই কিন্তু সাধারণ নন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা ভাবুন। তিনি মানুষের শরীর ধারণ করে এসেছিলেন। ওই খোলটুকুতেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর মিল। বাকি সবটুকুই দেবত্ব। তাঁর পার্ষদদের সম্পর্কেও একই কথা।

অনেক দিন আগেকার একটি ঘটনা মনে পড়ছে। বেলুড় মঠে একটি উৎসব হচ্ছে। হঠাৎ এক বাউলের দল এল। আগে মঠে এ রকম দেখা যেত। বাউলদের ডাকতে হয় না, ওরা নিজে থেকে এসে গেয়ে যায়। সেদিন ওরা গানে বলেছিল, এই যে নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, তারক প্রভৃতি, এঁরা যদি আলাদা আসতেন তবে অবতার বলে পূজা পেতেন, একসঙ্গে এসেছেন তাই বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

স্বামী বিবেকানন্দের মতো মানুষ যে কোনও দেশে যে কোনও সময়ে যদি আলাদা আসেন, তবে পৃথিবীর লোক কৃতার্থ হয়ে যায়। এ বিষয়ে মিস ম্যাকলাউডের উক্তি মনে পড়ে। স্বামীজীর কৃপাপ্রাপ্ত এই অসাধারণ বিদেশী

মহিলাটি দীর্ঘকাল বেলুড় মঠে ছিলেন। একদিন কলেজের কয়েকজন ছাত্র তাদের অধ্যাপকের সঙ্গে বেলুড় মঠে উপস্থিত। ওঁরা মিস ম্যাকলাউডকে স্বামীজী সম্পর্কে কিছু বলতে অনুরোধ করেন। তিনি বললেন : তোমরা স্বামীজীকে এখন বুঝবে না। দেশ যদি কোনও দিন স্বাধীন হয় তবে সেদিন বুঝবে। আমাদের দেশে যদি তিনি জন্মাতেন, দেখতে, কী সম্মান তাঁকে আমরা দিতাম। মাথার মণি করে রাখতাম তাঁকে। কিন্তু তোমাদের দেশ, হায়, এ এক আত্মবিস্মৃত দেশ! নিজেকে ভুলে গিয়েছে, নিজের মানুষকে চিনতে পারে না।

মিস ম্যাকলাউড সারা পৃথিবী ঘুরেছিলেন। বারনারড শ-এর সঙ্গে তাঁর রীতিমতো বন্ধুত্ব ছিল। তিনি বলতেন : পৃথিবীর দুই ব্যক্তি তাঁকে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছেন—স্বামী বিবেকানন্দ ও জারমানির কাইজার। স্বামীজী ওঁকে খুব স্নেহ করতেন, তারিফ করতেন ওঁর সংগঠন ক্ষমতার।

মিস ম্যাকলাউড যখন বেলুড় মঠে থাকতেন সেই সময়ে তাঁর জন্মদিনে আমরা কেক-টেক খেতাম, তাঁকে বলতাম ট্যানটিন—পিসীমা। জন্মদিনে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতাম, পিসীমা তোমার বয়স কত হল? তখন তিনি রীতিমতো বৃদ্ধা। হয়তো বলতেন, এই চল্লিশ হল। শুনে কেউ ঠাট্টার সুরে মন্তব্য করত, তোমাদের দেশের

মেয়েরা তো বয়স চুরি করে, আসল বয়স বলে না। পিসীমা তখন স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলতেন : দেখ, স্বামীজীকে যেদিন সাক্ষাৎ করেছি, সেই দিনই আমার প্রকৃত জন্মদিন। ওই দিন থেকে আমি বয়সের হিসাব করি। তার আগে কি আর মানুষ ছিলাম !

স্বামীজীর প্রতি তাঁর ভক্তির তুলনা হয় না। মেরি লুই বার্ক বলেন পাশ্চাত্যদেশবাসীদের প্রতি স্বামীজীর বিশেষ অনুগ্রহ। আমরা বলি, স্বামীজী আমাদের। উনি দাবি করেন, স্বামীজী ওঁদের। বলেন : যেসব উদ্দীপক কথা স্বামীজী ওঁদের বলেছেন, সেসব ভারতবর্ষে তিনি বলেননি।

স্বামীজী যখন থাউজ্যানড আইল্যানড পার্ক-এ ছিলেন, তখনকার একটি ঘটনা উল্লেখ করবার মতো। প্রশান্ত মহাসাগরের ওই দ্বীপে তখন তিনি ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি শেখাচ্ছেন। একদিন রাত নটায় দুটি অপরিচিত মেয়ে ঘুরতে ঘুরতে ওখানে উপস্থিত। স্বামীজীকে দেখে ওরা বলছে : শুনেছি, আপনি এখানে আছেন, তাই এসেছি। যেমন একদিন সবাই আসত যীশুখ্রীষ্টের কাছে, তেমনই আজ আমরা এসেছি আপনার কাছে। আপনি সেই ঈশ্বরের দূত। স্বামীজী তখন বলছেন : আমার যদি খ্রীষ্টের মতো ক্ষমতা থাকত, তবে এখনই তোমাদের মুক্ত করে দিতাম।

স্বামী অভেদানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষে একবার একটি ঘরোয়া সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। কলকাতার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ নাগরিক সভায় উপস্থিত। আমি সেখানে ছিলাম। মনে আছে, অভেদানন্দজী সেদিন কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী সম্পর্কে বলেছিলেন :

স্বামীজীকে যেদিন বিলাতে প্রথম দেখলাম, তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আর পাণ্ডিত্যের শক্তি দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ভাবছিলাম, আমাদের সেই নরেন, যাঁর সঙ্গে শাস্ত্র নিয়ে কত তর্ক-আলোচনা করেছি, তাঁর এই তেজোময় ব্যক্তিত্ব ! এসব ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া হয় না।

যেমন বুদ্ধি, তেমন হৃদয়, তেমনই কর্মশক্তি, তেমনই ব্যক্তিত্ব—স্বামীজী সব দিক দিয়েই অনন্য। কাজেই তাঁকে কেউ অবতার বললে সেটা অতিকথন হয় না।

রোমাঁ রোলাঁ বলেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ কোথাও দ্বিতীয় স্থানে আসীন, একথা তিনি ভাবতেই পারেন না। বস্তুত, সকল ক্ষেত্রেই তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করে থাকতেন। দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি, দেশের বিবিধ সমস্যা—যে কোনও বিষয়ে আলোচনা বা তর্ক হোক না কেন, তাঁর সঙ্গে কেউ এঁটে উঠতে পারতেন না। হাসি, গল্প, ঠাট্টার বেলাতেও তা-ই। সব রকম গান তিনি জানতেন। স্বামী সারদানন্দ বলতেন : আমার

গানে রুচি ছিল না, কিছু বাজাতেও পারতাম না। কিন্তু স্বামীজীর চাপে পড়ে একটু বাজনা শিখতেই হল। স্বামীজী তখন তাঁর দিদিমার বাড়ীর একটা চিলেকোঠায় থাকেন। সেখানে আছে একটা তানপুরা, আর একটা ভাঙা বাঁয়া। গানের সঙ্গে ঠেকা না হলে চলে না। স্বামীজীর ওখানে গেলে তাই বাধ্য হয়ে আমাকে ঠেকা দিতে হত। ওই করতে করতে তবলা শিখে গেলাম।

এমনই মানুষ স্বামীজী। নিজে আনন্দে ভরপুর, অপরের মনও ভরিয়ে দিতেন আনন্দে। কখনও গম্ভীর মুখ করে থাকতেন না। একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল ঃ মশায়, আপনি কি গম্ভীর হতে পারেন না? স্বামীজীর উত্তর ঃ পারি বই কি। যখন পেট কামড়ায় তখন গম্ভীর হই।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে নিত্যসিদ্ধ বলে পাতালকোঁড়া শিবের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কোনও-কোনও জায়গায় শিব-লিঙ্গ যেমন আপনি-আপনি আবির্ভূত হন, নিত্যসিদ্ধদের পৃথিবীতে আসা সেইরকম। স্বামী ওঁকারানন্দ (অনঙ্গ মহারাজ) বলতেন ঃ আমরা যখন প্রথম মঠে যাতায়াত করি, স্বামীজীর বই-টই পড়ি, তাঁর ছবি দেখি, তখন ভাবতাম, আমাদেরও তো ওইরকম স্বাস্থ্য আর পড়াশুনোও তো কিছু আছে—স্বামীজী বি. এ., আমি এম. এ. পাশ করেছি—স্বামীজীর চেয়ে আমরা এক পা এগিয়ে যাব।

কিন্তু যত দিন যাচ্ছে ততই দেখছি, কোথায় স্বামীজী, আর কোথায় আমরা! সারা জীবন কাটিয়ে দিলাম, তবু তাঁকে বুঝতেই পারি না। আর তাঁকে ছোঁয়া? সে তো আরও কঠিন।

ছোটবেলা থেকেই স্বামীজীর জীবন অদ্ভুত। মহাবীর হনুমানের কাহিনী শোনার পর শিশু বীরেশ্বর হনুমানের দর্শন পাওয়ার জন্য কলাবনে গিয়ে বসে থাকতেন। আবার শুনেছিলেন, নীচু জাতের উচ্ছিষ্ট হুঁকোয় তামাক খেলে জাত যায়। জাত-যাওয়ার ব্যাপারটা পরখ করে দেখবার জন্য ওঁর বাবার ঘরে যত হুঁকো থাকত সেগুলো একে একে টেনে দেখেছেন। তখন তিনি নিতান্ত বালক। একদিন ওই রকম করছেন এমন সময় ওঁর বাবা —তিনি ছিলেন অ্যাটর্নি—এসে পড়েছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কী রে বিলে, কী করছিস। ছেলের উত্তর ঃ জাত কোথায় যায়, দেখছি।

বাল্যজীবনে তাঁর প্রধান খেলা কী ছিল? ধ্যান-ধ্যান খেলা। শুনেছেন, ধ্যান করতে করতে সাধুদের মাথায় জটা হয়, আবার সেই জটা লম্বা হয়ে মাটিতে ঢুকে যায়। বালক বীরেশ্বর ধ্যান করতে করতে দেখতেন, ওঁর মাথায় জটা বেরুল কি না। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে চিলেকোঠায় ধ্যান-ধ্যান খেলা হচ্ছে, হঠাৎ সেখানে এক গোখরো সাপ

এসে হাজির। কিন্তু সেই আশ্চর্য বালকের কোনও খেয়ালই নেই।

স্বামীজীর ধ্যানের যে বিখ্যাত আলোকচিত্রটি আছে, সেটি লনডনে তোলা। ওঁর অনুরাগীরা স্বামীজীর ধ্যান-মূর্তির একখানি ছবির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। একদিন ছবি তোলার ব্যবস্থা হল। স্বামীজী স্থির হয়ে বসলেন, সঙ্গে সঙ্গে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন!

শঙ্করাচার্য সন্ন্যাসীর পরিচয় দিচ্ছেন এইভাবে:

বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তো,
ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
বিশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ,
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥[১]

—বেদান্তবাক্য সন্ন্যাসীর আদর্শ। শুধু ভিক্ষালব্ধ অন্নে সন্ন্যাসী প্রসন্ন। অন্তর সদা প্রফুল্ল। কোনও শোক-ক্ষোভ নেই, কৌপীনমাত্র পরিধান করে এই যে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করা সম্ভব হচ্ছে, তাতেই তিনি নিজেকে ভাগ্যবান জ্ঞান করবেন।

এই আদর্শ স্বামীজীর জীবনে প্রতিফলিত। আমেরিকায় পারলামেনট অব রিলিজিয়নস-এ বক্তৃতার পর

১। আত্মবোধঃ (Self-knowledge), স্বামী নিখিলানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মাদরাজ, প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ২৮৫ ॥

তাঁর যখন খুব সম্মান হল, চারিদিকে লোকজন তাঁর প্রশংসায় মুখর, তাঁকে দেখলেই লোকে পিছনে ছুটছে, সেই সময় যে-বাড়িতে তিনি আছেন, সেখানে বসে কাঁদছেন: এ কী হল? এই নাম-যশ-খ্যাতি, এসবের কী প্রয়োজন আমার? বলছেন: মা, আমাকে তুমি আমার পুরনো জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। এসব আমি চাই না।

এ কথা বলা তাঁর পক্ষেই সম্ভব। আমেরিকা থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: '...আমার নামের আবশ্যক নাই—I want to be a voice without a form [আমি নিরাকার বাণী হতে চাই]...আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী।' স্বামীজী বলেছেন: 'যদি আমি জগতের কোথাও সত্য ও ধর্ম সম্বন্ধে একটি কথা বলিয়া থাকি, তাহা আমার গুরুদেবের—আর ভুলভ্রান্তিগুলি আমার।'

শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠাকে ঘৃণা করতেন। স্বামীজীরও সেই মনোভাব। শেকসপীয়র বলেছেন: নাম যশের আকাঙ্ক্ষা মানুষের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। স্বামীজী তার ধার ধারতেন না। কোথায় কোন্ কাগজে তাঁর সম্পর্কে কী প্রশংসার কথা ছাপা হয়েছে, এ-বিষয়ে তাঁর কৌতূহল ছিল না। সেসব তিনি দেখতেও চাইতেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন, নরেন পদ্মের মধ্যে সহস্রদল। তাঁর সম্পর্কে গান এবং অন্যান্য রচনা অনেক আছে। কয়েকটি নমুনা দিই। গিরিশচন্দ্র একটি কবিতায় বলছেন :

'তারা উজ্জ্বল পশিল ধরাপর, নির্মল গগন বিকাশি।'

অর্থাৎ নির্মল আকাশ থেকে একটি উজ্জ্বল তারা এই ধরায় আবির্ভূত হচ্ছে। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেই অলৌকিক দর্শনের কথা আসছে। একটি দেবশিশু সপ্তর্ষি-মণ্ডলের এক ঋষিকে জড়িয়ে ধরে বলছেন : আমি যাচ্ছি, তুমি আসবে না? চল, এস।

আবার স্বামী সারদানন্দ (শরৎ মহারাজ), তাঁর গুরু-ভাই, বলছেন :

তারা জলি ছায়া পথে স্পর্শে ধরা আচম্বিতে,
পুণ্যভূমে উদে আজি পুনঃ নর-নারায়ণ।

আর এক সন্ন্যাসী, স্বামী প্রেমেশানন্দ, তাঁর বর্ণনা দিচ্ছেন :

শ্মশান-আলয় সন্ন্যাসী-বেশ নাহিক অন্তরে বাসনার লেশ
নির্ভীক চিতে ভ্রম ধরণীতে, মরণভীতি-বারণ।

নীরদরঞ্জন মজুমদার বলছেন :

কে তুমি যতি, মোহন মূরতি রতিপতি-ভাতি নয়ন-রঞ্জন।
বদনমণ্ডল প্রেমে ঢলঢল অমল কোমল প্রিয় দরশন॥

কবি নজরুল ইসলাম তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন :

যজ্ঞাহুতির হোম-শিখাসম
তুমি তেজস্বী তাপস পরম।
ভারত-অরিন্দম, নমো নমঃ, বিশ্ব-মঠ-বিহারী॥

আর এক ভক্ত কবির (বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত) ভক্তি-অর্ঘ্য :

মহাযোগে রাজে যোগী কিবা শুভ্র জ্যোতি ধারা।
অরূপ অখণ্ডলোকে আদি অন্ত সীমাহারা॥
মানব কল্যাণ লাগি যেদিন মেলিলা আঁখি ;
ঝলসি উঠিল বিশ্ব ছুটিল আলোকধারা॥

এই সব বর্ণনায় স্বামীজীর দেবোপম মূর্তিটি পরিস্ফুট।

নিত্যসিদ্ধ প্রসঙ্গে স্বামী শিবানন্দের জীবনের একটি ঘটনা বলি। তিনি তখন মঠের অধ্যক্ষ, অনেক বয়স, শরীর ভাল নয়। পথ্য ছিল, করলার ঝোল আর দুধভাত —আহার বলতে ওই। একদিন হঠাৎ বললেন, আজ ঠাকুরকে যা নিবেদন করা হয়েছে, নিয়ে আয় আমার সামনে। সবাই প্রমাদ গনলেন। তিনি যদি খেতে চান? আবার তাঁর আদেশ অমান্য করাও যায় না। কিছুক্ষণ পরে তাই থালায় ভোগ সাজিয়ে তাঁর কাছে আনা হল। স্বামী গঙ্গেশানন্দ (দ্বিজেন মহারাজ)—খুব বেপরোয়া তিনি—এসে বললেন : দেখুন মহারাজ, আমার পাপ হোক আর যা-ই হোক, এ আমি কিছুতেই আপনাকে

যেতে দেব না। যদি অসুখ করে? স্বামী শিবানন্দ বললেন: কী আমি খাব না? নিশ্চয় খাব।—এই বলে প্রত্যেক জিনিসে আঙুল ঠেকিয়ে সেই আঙুল একবার জিভে ঠেকালেন। তারপর সব ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বললেন। পরে তিনি বলেছিলেন: খাব বলেছি, মানে কি সত্যি সত্যি খাব? দেখ্, স্বামীজী আমাকে মহাপুরুষ বলতেন। আমি যদি ইচ্ছা করি, এই মুহূর্তে শরীরছেড়ে দিতেপারি। গুরুর কৃপায় জেনেছি, এ দেহ আমি নই। আমি শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত আত্মা। কী মনে ভাবিস তোরা? তখন সবাই হাতজোড় করে ক্ষমা চান। এঁরা সব নিত্যসিদ্ধ।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন, **নিত্যসিদ্ধ একটি থাক্ আলাদা। …এরা কখনও সংসারে আসক্ত হয় না।** উদাহরণ হিসাবে বলছেন, প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদের কাহিনী একটু মনে করিয়ে দিচ্ছি। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুর নাম, হরির নাম শুনতে পারতেন না। এ হল শত্রু রূপে ঈশ্বরের আরাধনা। আর প্রহ্লাদ জন্ম থেকেই হরিভক্ত, তাঁর নাম করেন। দৈত্যরাজ এতে বিরক্ত। তিনি চেষ্টা করছেন, প্রহ্লাদ যাতে বিষ্ণুর নাম না শোনেন, তাঁর নাম না করেন। সেই চেষ্টা বিফল দেখে তিনি প্রহ্লাদের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। প্রহ্লাদকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা হল। তাঁকে পাহাড়ের উপর থেকে ছুঁড়ে ফেলা হল, হাতির পায়ের

নীচে ফেলা হল, আগুনে নিক্ষেপ করা হল, সামনে সাপ ছেড়ে দেওয়া হল, বিষ দেওয়া হল—দেখা গেল, কিছুতেই তাঁর মৃত্যু নেই। হিরণ্যকশিপু তখন ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোকে বাঁচায় কে? প্রহ্লাদ বললেন: আমাকে বাঁচান হরি। দৈত্যরাজ আবার জিজ্ঞাসা করলেন: কোথায় তোর হরি? প্রহ্লাদের উত্তর: তিনি সর্বত্র বিরাজ করছেন। হিরণ্যকশিপু একটি স্তম্ভ দেখিয়ে বললেন, এর মধ্যেও তোর হরি আছে? শান্তকণ্ঠে প্রহ্লাদ জানালেন, এখানেও তিনি আছেন। উত্তর শোনার সঙ্গে সঙ্গে পদাঘাত। স্তম্ভ থেকে সেই মুহূর্তে বেরিয়ে এলেন নৃসিংহমূর্তি। হিরণ্যকশিপু এর আগে বর পেয়েছিলেন, কোনও মানুষ অথবা পশু তাঁকে বধ করতে পারবে না। আবার মাটিতে অথবা আকাশে তাঁর মৃত্যু ঘটবে না। তাই এই নৃসিংহমূর্তি; এবং তিনি দৈত্যরাজকে হাঁটুর উপর রেখে বধ করলেন। আবার বর ছিল, দিনে বা রাত্রে তাঁর মৃত্যু হবে না। এই ঘটনা তাই ঘটল দিন-রাত্রির সন্ধিক্ষণে।

নিত্যসিদ্ধ পুরুষরা প্রহ্লাদের মতো—ভগবানের প্রতি তাঁদের ভক্তি জন্ম থেকেই। সাধারণ মানুষ ভগবানের নাম করে, আবার সংসারে, কামিনীকাঞ্চনে মুগ্ধও হয়। মাছি ফুলে বসে, সন্দেশে বসে, আবার বিষ্ঠাতেও বসে।

নিত্যসিদ্ধ যেন মৌমাছি - মধু তার একমাত্র আহার। শ্রীশ্রীঠাকুরের অপূর্ব উপমা !

আমরা কত রকমের মানুষ দেখি। কাউকে বলে বোঝাতে হয় না—স্বেচ্ছায়, স্বাভাবিকভাবে সে ভগবানের নাম করে। কাউকে হয়তো অনেক বোঝাতে হয়। আমরা ভক্তিলাভের জন্য মন্দিরে যাই, সাধুসঙ্গ করি। এ সবই ভাল। কিন্তু যাঁরা নিত্যসিদ্ধ, ভক্তি তাঁদের সাথী। সব সময় তাঁদের হৃদয় ভক্তিপূর্ণ। তুলসীদাস বলছেন, 'রসময় স্বাভাবিক।' 'রস' মানে ভক্তি। অর্থাৎ ভক্তিরস স্বতঃ উৎসারিত হয়। এত সময় ধ্যান, এত জপ ইত্যাদি —এ হচ্ছে বিধিবাদীয় ভক্তি। যাঁরা দীক্ষা নেন, তাঁদের অনেক সময় বলা হয়ে থাকে, এত জপ করবে। কিন্তু শ্রীশ্রীমা বলেছেন : অত হিসেব করবার দরকার কী! ভগবানকে ডাকবে, তাই ডাকবে ; হিসেব করতে গেলে মনটা হিসেবেই চলে যায়। বেলুড় মঠে স্বামী শান্তানন্দের দিনরাত জপ করার অভ্যাস ছিল। ঘুরছেন, ফিরছেন, আবার তারই মধ্যে কোথাও বসে জপ করছেন। স্নান, কাপড়ছাড়া ইত্যাদির পর ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে অনেক জপ করেন। স্বামী শান্তানন্দের ওসব ছিল না। হয়তো বিছানায় বসেই জপ করলেন। বিধিবাদীয় ভক্তিতে নিয়মের উপর জোর পড়ে। স্বামীজী বলেছেন, সোনার শিকলও শিকল।

নিত্যসিদ্ধ একটি থাক আলাদা

বলছেন : It is good to be born in a church, but it is bad to die in a church. গিরজায় জন্মালাম, গিরজাতেই মারা গেলাম—এ ভাল নয়। অর্থাৎ নিয়ম-আচারের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে থাকা কোনও কাজের কথা নয়। নিয়ম প্রথমে ভাল, পরে আবার নিয়ম কী? স্বামী ব্রহ্মানন্দ ভগবানের সঙ্গে আটপৌরে সম্পর্ক গড়ে তোলার কথা বলতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন : ক্ষেতে যখন ধান গাছ রয়েছে, তখন সেই জায়গা পার হতে গেলে আল দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হয়। এটি বিধিবাদীয় ভক্তির সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু ধান পাকলে আর তা কাটা হয়ে গেলে, আল ধরে যেতে হয় না। সোজা মাঠের ভিতর দিয়ে যাওয়া যায়। আর একটি উপমা : সম্মুখের গ্রামে যেতে হবে নদীপথে, বাঁকা নদী, তাই ঘুরে ঘুরে যেতে হয়। কিন্তু যদি বন্যা হয়? তাহলে আর ঘুরতে হয় না, নৌকায় সোজা গন্তব্যস্থলে পৌঁছোনো যায়। তাই বলছেন : ঈশ্বরপ্রেমের বন্যা যদি হয়, তবে আর নিয়মের আঁকাবাঁকা পথের দরকার হয় না। ওই উচ্ছ্বসিত ঈশ্বরপ্রেমের আর এক নাম প্রেমাভক্তি, রাগভক্তি। এই ভক্তির সার কথা ভালবাসা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী দেখুন। তিনি ভগবানকে একান্ত আপনার জন রূপে দেখেছেন—কখনও মাতৃভাবে,

কখনও সন্তান রূপে, কখনও সখার মতো, কখনও প্রেমাস্পদ রূপে। গোপালের মা'র ছিল এই রকম ভালবাসা। আপনি যদি কাউকে ভালবাসেন, তবে মনে হবে, সে যেন আপনার উপর নির্ভর করে আছে। আপনাকে না হলে তার চলবে না। তাকে শিশুর মতো মনে হবে। জয়রামবাটীতে জগদ্ধাত্রী পূজা হয়। শ্রীশ্রী-মায়ের যিনি মা, শ্যামাসুন্দরী দেবী. তিনি জগদ্ধাত্রীর দর্শন পেয়েছিলেন। তার পর ওই পূজা আরম্ভ হয়। প্রথমবার পূজা যখন শেষ হল, শ্যামাসুন্দরী দেবী তখন জগদ্ধাত্রী প্রতিমার দিকে তাকিয়ে বললেন: মা-জগা আবার আসিস। আমাদের দেশে মেয়েরা মা-দুর্গাকে বিসর্জনের দিন বিদায় দেবার সময় কানে-কানে বলে দেয়: মা আবার আসিস। মেয়ে তো! শ্বশুরবাড়ি থেকে যেন পিতৃগৃহে এসেছে। যাওয়ার সময় তাই নারকেল-নাড়ু, মুখে পান ইত্যাদি দিয়ে কানে-কানে ওই কথা বলা হয়। শ্রীশ্রী-ঠাকুরের মা যখন অন্তঃসত্ত্বা, ঠাকুর গর্ভে এসেছেন, সেই সময় একদিন দেখলেন, হাঁসে চড়ে ব্রহ্মা এসেছেন। তাঁর মুখখানি লাল। এই দেখে ঠাকুরের মা বলছেন: তুমি রোদের মধ্যে এসেছ, তাই তোমার মুখখানি লাল হয়েছে। একটু পান্তাভাত খাবে?—এর নাম ভগবানকে ভালবাসা। আমি যা খাই, তা-ই তাঁকে দেব। তিনি যে আপনার জন! শ্রীশ্রীমাকে দেখি, ঠাকুরের ছবি নিয়ে গরুর গাড়ি করে তিনি দেশে যাচ্ছেন; পথে পুকুর-পাড়ে রান্না হচ্ছে। ভাতের হাঁড়ি নামাতে গিয়ে ভেঙে গেল। কলাপাতায় সেই ভাত কুড়িয়ে ঠাকুরকে নিবেদন করছেন: ঠাকুর, যা দিয়েছ, আজ তা-ই তোমাকে দিচ্ছি, আর কী দেব? এই প্রসঙ্গে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের কথাও বলি। তখন তিনি মাদরাজে আছেন। সেখানে খুব কষ্ট। ঠাকুরকে নিয়মিত যে দু-পয়সার বাতাসা ভোগ দেবেন, এমন নিশ্চয়তাও নেই। একদিন তিনি ঠাকুরকে অভিমান-ভরে বলছেন: আজ ভাঁড়ার শূন্য, কিছু নেই। আমি যাব ওই সমুদ্রের ধারে, সেখান থেকে বালি কুড়িয়ে এনে তোমাকে ভোগ দেব, তারপর আমি প্রসাদ পাব। যদি বালি প্রসাদ গলা দিয়ে নামতে না চায়, তবে জোর করে নামাব। আমাকে পরীক্ষা করছ তুমি?—ঘর বন্ধ করে এইসব বলছেন, এমন সময় হঠাৎ দরজায় ধাক্কা। কুলির মাথায় প্রচুর জিনিস-সহ এক ভক্ত এসেছেন। তখন আবার কান্না। এই হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক! ভক্তমাল গ্রন্থে আছে:

> সদা কৃষ্ণ ব্যাঘ্র হইতে রক্ষার কারণে।
> লগুড় হস্তেতে ফিরে শ্রীকুঞ্জের বনে॥[২]

২। ভক্তমাল. তৃতীয় মালা॥

—শ্রীকুঞ্জের বনে শ্রীকৃষ্ণ রয়েছেন। তাঁকে বাঘের কবল থেকে রক্ষা করবার জন্য গোপীরা লাঠিহাতে ঘোরাফেরা করছেন। যিনি সকলের রক্ষাকর্তা, তাঁকে রক্ষা করবার জন্য গোপীরা ব্যস্ত! শ্রীকৃষ্ণ পথ দিয়ে চলেছেন, গোপীদের তখন ভাবনা হচ্ছে, তাঁর পায়ে যদি কাঁটা ফোটে? ভাবছেন: আমাদের শরীর ওঁর পায়ের তলায় থাকুক, তা হলে কাঁটা বিঁধবে না।

শ্রীশ্রীমা একবার গরুর গাড়িতে আসছেন। সমস্ত রাত গাড়ি চলছে, তিনি মাঝরাতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। এখন, এক জায়গায় রাস্তা কাটা হয়েছে। সুতরাং গাড়ি যাবার সময় ওই জায়গায় যে ঝাঁকুনি লাগবে তাতে মায়ের ঘুম ভেঙে যাবার আশঙ্কা। স্বামী ত্রিগুণাতীত সঙ্গে ছিলেন, তাঁর ভাবনা হল। তিনি স্থির করে ফেললেন, ওই জায়গার ফাঁকটাতে শুয়ে পড়বেন, গাড়ি তাঁর পিঠের উপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে চলে যাবে, তা হলে আর মায়ের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে না। যেমন ভাবা তেমনই কাজ। কিন্তু ওই সময়ে মায়ের ঘুম হঠাৎ ভেঙে গিয়েছে। স্বামী ত্রিগুণাতীতের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তিনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন: করছ কী, শিগগির উঠে এস।—ভক্তি-ভালবাসার একটি আশ্চর্য নিদর্শন এখানে পাই।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন: প্রেমাভক্তিতে বিশেষ দুইরকম

আছে—'অহংতা' আর 'মমতা'। আমি না হলে আমার প্রিয়তমকে কে দেখবে? এর নাম 'অহংতা'। ভালবাসার পাত্রকে এখানে দুর্বল, অক্ষম বোধ হয়। আর 'মমতা' হচ্ছে—যেমন, আমার কৃষ্ণ, আর কারও না। এই 'অহং' আর 'মম' খুব ভাল, নিন্দনীয় নয়।

ঈশ্বরপ্রেম কয়েক রকমের। যেমন: একাঙ্গী প্রেম, সাধারণী প্রেম, সমর্থা প্রেম। একাঙ্গী প্রেম কী রকম? না, যেমন হাঁস জলকে চায়, জল হাঁসকে চায় না। আমি প্রভুকে চাই—তিনি আমাকে চান বা না-ই চান। ভক্তমাল-এ আছে:

> মাধুকরী ভিক্ষা করি উদর ভরহ।
> সুকুমার কৃষ্ণচন্দ্রে দুঃখ নাহি দেহ ॥[৩]

—অর্থাৎ ভিক্ষা করে পেট ভরাও। কৃষ্ণ, আমাকে খেতে দাও, পরতে দাও, এসব বলে কেন তাঁকে দুঃখ দেবে? এভাবে তাঁকে বিরক্ত করবে না। ছেলেমানুষ, কোমল-শরীর কৃষ্ণকে কষ্ট দেবে না।

এই হচ্ছে একাঙ্গী প্রেম। সাধারণী প্রেমে মনোভাব হল: তুমি সুখী হও বা না হও, আমি যেন সুখে থাকি। দৃষ্টান্ত: চন্দ্রাবলীর প্রেম। এটি সাধারণ মানুষের

৩। ভক্তমাল, দ্বিতীয় মালা॥

মনোভাব। সমর্থা প্রেম, যেমন গোপীদের কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণসুখেই গোপীদের সুখ। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে :

বাৎসল্য ভক্ত পিতামাতা যত গুরুজন।
মধুর রস মুখ্যভক্ত ব্রজে গোপীগণ ॥[৪]

বৈষ্ণব সাহিত্যে বলা হয়েছে, প্রেম বাঁধবার দড়ি, এই দড়ি দিয়ে ভগবানকে বাঁধা যায়।

পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥[৫]

ভাগবতে বলা হয়েছে, কৃষ্ণ প্রেমের বশ, প্রেম দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। ভগবান ভালবাসার কাঙাল। ভালবাসার শর্ত এই নয় যে, আমাকে এইসব পাইয়ে দাও, তবে তোমাকে ভালবাসব। কথা শুধু এই : আমি তোমাকে ভালবাসি, ভালবাসব। যথার্থ ভালবাসা এই রকম।

[৩১. ৩. ৭৬]

[আলোচিত অংশ : **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, প্রথম ভাগ** (১৮৮৩, ২৯শে মার্চ) ; পঞ্চম খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ; পৃঃ ৮৫।]

৪। চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ১৯ ॥
৫। চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ৮ ॥

সমাধি : তদাকারপ্রাপ্তি

আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় : সমাধি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমাধি হত। এ এক আশ্চর্য অবস্থা। ভগবানের চিন্তা করতে করতে সাধকের এমন অবস্থা হয় যে, নিজের সামান্যতম দেহবোধ পর্যন্ত থাকে না। একবার স্বামীজীর খুব ইচ্ছা হল, তাঁর সমাধি হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরকে ধরলেন। তিনি বললেন : যথাসময়ে হবে, এত ব্যস্ত কেন ? তা রোজই স্বামীজী ধ্যান করতে বসেন। একদিন এই রকম বসেছেন, তারপর কী হল কিছুই জানেন না। শেষে বলেন : আমার হাত কোথায়, পা কোথায় ? অর্থাৎ শরীরটাকে খুঁজে পাচ্ছেন না। সমাধিতে এই রকম অবস্থা হয়। ওই সময় মানুষ যেন ঈশ্বরের মধ্যে, সচ্চিদানন্দ সাগরের মধ্যে একেবারে তলিয়ে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন ঈশ্বরের ভাবে এমনই ভরপুর ছিল যে, একটুতেই তাঁর উদ্দীপন হত, সহজেই সমাধি হত। ভেজা স্যাঁতসেঁতে হলে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালানোর জন্য বার বার ঘষতে হয়। ঠাকুরের মন শুকনো কাঠির মতো—উদ্দীপিত হয়ে ওঠার জন্য সদা প্রস্তুত। সমাধির

পর অতি কষ্টে তিনি মনকে নীচে নামাতেন। হয়তো তখন বলতেন, জল খাব। ও একটা ইচ্ছার আভাসমাত্র; ওই সূত্র ধরে যেন মনকে জাগতিক স্তরে নামাচ্ছেন।

অবতার-পুরুষ যাঁরা, লোককল্যাণের জন্য তাঁরা স্বেচ্ছায় দেহ ধারণ করেন। এমনিতে সাধারণ মানুষের মতো তাঁদের রোগ, শোক, দারিদ্র্য। লোকশিক্ষার জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকেই তাঁরা অসাধারণত্ব দেখান। তাঁদের মধ্যে দেখি: ত্যাগ, বৈরাগ্য, ঈশ্বরপ্রেম, হৃদয়ের উদারতা, ক্ষমা ইত্যাদি। আমাদেরই মতো রক্তমাংসের শরীর, আহার-নিদ্রা সবই আছে, আবার তারই মধ্যে সকল ব্যাপারে দেখা যায় স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য। আশ্চর্য তাঁদের ব্যবহার, আশ্চর্য জীবন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবতারত্ব সম্পর্কে স্বামীজীর মনে ঠাকুরের জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত সন্দেহ ছিল। ভাবটা যেন এই: কী করে সম্ভব? এই তো তাঁকে দেখছি। হ্যাঁ, আমাদের চেয়ে নিশ্চয়ই আলাদা। সব রকম সাধনায় সিদ্ধ, ব্রহ্মজ্ঞ এবং ঈশ্বর প্রেমিক —নিঃসন্দেহে। কিন্তু ভগবানের অবতার, এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় কেমন করে? শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর-ত্যাগের কাল আসন্ন—এই সময় স্বামীজী ভাবছেন: এখন যদি নিজমুখে বলেন, উনি অবতার, তবে বিশ্বাস করব। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তখন বিছানায় চোখ বুজে আছেন।

স্বামীজীর মনে ওই চিন্তা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চোখ খুলে বলেছেন: এখনও সন্দেহ? যে রাম, যে কৃষ্ণ পূর্ব পূর্ব যুগে লীলা করে গিয়েছেন, ইদানীং তিনিই এ শরীরে রাম-কৃষ্ণ। তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।

অবতার-পুরুষের মন ঈশ্বরের সঙ্গে সতত সংশ্লিষ্ট। ভগবানের নামগানে তাঁর আনন্দ, আর কিছু তাঁর ভাল লাগে না। শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন: অমৃতের স্বাদ যে পেয়েছে, সে আর অন্য কিছু চায় না। ভাল সন্দেশ যে খেয়েছে, সে চিটে গুড় খেতে চাইবে কেন?

ছোটবেলায় এক গল্প পড়েছিলাম। এক দাসী কোনও এক বাড়িতে চাকরি করে। তার ইচ্ছা, সে খুব ধনী হয়। মনে মনে সে কল্পনা করছে, ধনী হলে কী করবে। সে দেখেছে, রাজা-রাজড়া ধনী লোকেরা দোলায় চেপে সফর করে। তাই সে ভাবছে, ধনী হলে সে দোলায় চেপে মনিবের বাড়ির জন্য জল নিয়ে আসবে। দাসীবৃত্তি ছেড়ে দেওয়ার কথা সে ভাবতে পারছে না! আমরাও কতকটা এই রকম ভাবি। অবতার-পুরুষরা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন, বুঝিয়ে দেন: তোমরা আনন্দ খুঁজছ? ঈশ্বরকে নিয়েই প্রকৃত আনন্দ। আর সব অর্থ-হীন, সামান্য সুখ।

কথামৃততে দেখছি, জনৈক ভক্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে

সমাধি-প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। এই সূত্রে স্মরণ করা যেতে পারে যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধির বিষয়ে প্রথমপ্রচার করেন একজন খ্রীষ্টান মিশনারি, জেনারেল অ্যাসেমবলিজ ইনসটিটিউশনের অধ্যক্ষ হেসটি সাহেব। কথা প্রসঙ্গে তিনি একদিন ছাত্রদের বলেন ঃ সমাধি কাকে বলে যদি জানতে চাও, তবে একবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে রামকৃষ্ণ পরমহংসকে দেখে এস। কী করে ভদ্রলোক এটি জেনেছিলেন, বলতে পারব না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমাধি দেখে অনেকে ভুল বুঝত। কেউ বলত, মৃগী রোগ ; কেউ ভাবত, হিসটিরিয়া। ঈশ্বরের নামগান করতে করতে মূর্ছা, এ আবার কী! খ্রীষ্টান ভদ্রলোকটির ধারণায় কিন্তু ভুল হয়নি।

যোগশাস্ত্রে আছে, সমাধি কাকে বলে। প্রথমে ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা করতে হয়। ধারণা করে তাঁতে মনটা লাগাতে হবে। মন লাগানো মানে ধ্যান—একাগ্র চিন্তা। ধ্যান যখন গভীর হবে, তখন সমাধি। ধ্যানের গভীরতা এমন হওয়া দরকার যে, মনে তখন অন্য কোনও চিন্তার লেশ থাকবে না। চিত্তবৃত্তির নিরোধ হবে। উপমায় বলা হচ্ছে ঃ যেন একটা বিরাট সরোবর রয়েছে, অনেক জল সেখানে, তলায় কী আছে কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কারণ ওই জল অস্থির। জল যদি স্থির হয় তবে দেখা যাবে,

মাছগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছে, পুকুরের ভিতর যা আছে, সবই দৃশ্যমান হবে। তরঙ্গের জন্য জলে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। সেই রকম মানুষের মনও চিন্তার তরঙ্গে সর্বক্ষণ আলোড়িত। ধ্যানের সময় ওই চিন্তাতরঙ্গকে প্রশমিত করতে হয়। ঠাকুর বলেছেন ঃ কেউ কেউ যখন ধ্যান করে, তখন তাদের মুখ দেখলে মনে হয়, যেন ওদের ভিতরে একটা সংঘর্ষ চলেছে। আবার কাউকে দেখে বোঝা যায়, তার মনে প্রশান্তির ভাব এসেছে। মুখে তার ছাপ পড়ে।

কিছুকাল আগে এক ফরাসী যুবক, ইনজিনীয়র, আমাকে বলেন ঃ এদেশে আপনারা এত দারিদ্র্যের মধ্যে কী করে বেঁচে আছেন, বুঝি না। আমি বললাম ঃ আমরা তো চিরকালই দরিদ্র। শত শত বছর এই ভাবেই তো বেশ বেঁচে আছি। যুবকটি বললেন ঃ দেখুন, আমার বাবা, মা ক্যাথলিক, ধর্মপ্রাণ। ছোটবেলায় আমিও ক্যাথলিক স্কুলে পড়েছি। বড় হয়ে কিন্তু ধর্মে মতি নেই। বাবা-মার তাই খুব দুঃখ। যা-ই হোক, আপনাদের দেশে এসে অবাক হয়ে গিয়েছি। গ্রামের মানুষ, সাধারণ মানুষের চোখে-মুখে একটা আশ্চর্য শান্ত ভাব দেখি, দেখে ভাবি, কী পেয়েছে এরা, কোথায় এদের প্রশান্তির উৎস! আমাদের দেশের বিত্তবানেরাও এই শান্তি আর আনন্দ থেকে বঞ্চিত।

'যোগ' বলতে কী বোঝায়? 'যোগ' মানে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেছেন: শ্রীশ্রীঠাকুর দেবলোক আর মর্ত্যলোকের মধ্যে একটা সিঁড়ি তৈরি করে দিয়েছেন। তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন, মানুষ কেমন করে দেবতার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত, এমন মানুষ দেখলে আমরা অবাক হয়ে যাই। মানুষের এই ট্রানসফরমেশন বা আমূল পরিবর্তন বিস্ময়কর তো নিশ্চয়ই। স্বামীজী বলেছেন: একটি রাসায়নিক উপাদানের সঙ্গে অন্য উপাদানের মিশ্রণে যেমন রঙের পরিবর্তন হয়, তেমনই উৎপন্ন জিনিসটিতে নতুন গুণেরও প্রকাশ ঘটে; ঠিক সেই রকম মানুষের মনেও নানা প্রক্রিয়া ঘটানো যায়। যে প্রক্রিয়ায় মানুষ দেবতা হয়ে যায়, তাকেই 'যোগ' বলা যায়। যোগের শেষ কথা সমাধি—সেখানে চিত্তবৃত্তির নিরোধ। আমাদের মন রবারের মতো। অধিকাংশ সময় সে থাকে টান টান অবস্থায়, অর্থাৎ সেখানে টেনশন থাকে। গভীর ধ্যান বা সমাধির সময় মন তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায়। সেখানে তখন চিন্তার রেখামাত্র থাকে না। এমনিতে ঘুমে আমরা স্বপ্ন দেখি। কিন্তু নিদ্রা গাঢ় হলে স্বপ্ন দেখি না। এই গভীর নিদ্রাকে বলে সুষুপ্তি। সুষুপ্তির সঙ্গে সমাধির অবস্থার তুলনা করা যায়। সুষুপ্তির পর স্থান-কাল সম্পর্কে

কিছুক্ষণ যেন স্পষ্ট জ্ঞান থাকে না। গীতায় সমাধিকে বলা হয়েছে 'ব্রাহ্মী স্থিতিঃ'[১]—ব্রহ্মে অর্থাৎ ঈশ্বরে স্থিতি। শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন বলেছেন: মৌমাছি গুনগুন করছে, তার পর একটা ফুলে গিয়ে বসল। এক মনে তখন সে মধু খায়—আর কোনও শব্দ শোনা যায় না। আমাদের মন এমনিতে চঞ্চল। ভগবানের চিন্তা করতে করতে মন যদি স্থির হয়, যদি ধ্যানে নিমগ্ন হতে পারি, তা হলে প্রকৃত আনন্দের স্বাদ পাই। স্বামী যতীশ্বরানন্দ বলতেন: শরীর মন যখন ক্লান্ত, তখন যদি একঘণ্টা ধ্যান করতে পারি, তবে আমার সব অবসাদ দূর হয়ে যায়।

গভীর ধ্যানে অসীম আনন্দ, অসীম তৃপ্তি—এই কথা। কবীরের গানে আছে:

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে, আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে, পাবিরে প্রেম রত্নধন ॥
ডুব ডুব্ ডুব্ ডুবলে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানের বাতি, হৃদে জ্বলবে অনুক্ষণ ॥

কবি এখানে মনকে রূপসাগরে ডুব দিতে বলছেন, যে রূপসাগর আছে হৃদয়ের ভিতরে; সেখানে ডুব দিতে পারলে বস্তুলাভ হয়। বলছেন: বৃন্দাবনকে নিজের অন্তরেই পাওয়া যায়। আমরা যে তীর্থস্থান বৃন্দাবনে যাই,

১। গীতা, ২।৭২।

সে ওই অন্তরের বৃন্দাবনকে, পাওয়ার আশাতেই। স্বামীজীর সেই প্রিয় 'মন চল নিজ নিকেতনে' গানে 'নিজ নিকেতনে' কথার অর্থ নিজের হৃদয়, যেখানে ঈশ্বর অধিষ্ঠিত। ওই গানে বলা হয়েছে, আমরা এই সংসারে বিদেশীর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। ভগবানকে ভুলে থাকা, তাঁর চিন্তায় স্থিত হতে না পারা মানেই তো বিদেশে অনাত্মীয়দের মধ্যে ঘুরে বেড়ানো। সাধক-কবি কমলাকান্ত বলছেন:

আপনাতে আপনি থেকো মন যেও নাকো কারু ঘরে।

অন্য কোথাও প্রকৃত আনন্দ নেই, সব আনন্দের উৎস আমাদের ভিতরের সত্তা। বাইরের যেসব ভোগ্য বস্তু আছে, তা সকলকে সমান সুখ দিতে পারে না। বারো-চোদ্দ বছরের ছেলে একটা সাইকেল পেলে যেন হাতে স্বর্গ পায়—এমন আমরা দেখেছি। কিন্তু ওই বস্তু কি বৃদ্ধকে আনন্দ দিতে পারে? কেউ বই পড়ে তৃপ্তি পায়, কেউ বা গান শুনে। প্রকৃত, অপরিচ্ছিন্ন আনন্দ পাওয়া যাবে 'নিজ নিকেতন' অর্থাৎ হৃদয়ের গভীরে। এই আনন্দলাভের জন্য প্রথমে বাইরের উপাদানের দরকার হয়। যেমন, ভগবানের নানা মূর্তি। তাঁর মূর্তিচিন্তা। ধীরেধীরে সেটি ভগবৎ-চিন্তায় রূপান্তরিত হয়। ভগবান, এই নামটি শুনলেইতখন আনন্দ। স্থূল থেকে ক্রমে আরও সূক্ষ্মে চলে যাই। মন যখন ধ্যানে বসে তখন কী রকম হয়? গীতার সেই শ্লোকটি মনে করুন:

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥[২]

ধরুন, একটি ঘরে প্রদীপ জালিয়ে রাখা হয়েছে, সেখানে একটুও হাওয়া নেই। তখন প্রদীপটির চেহারা কী রকম হয়? তার শিখা তখন একটুও কাঁপে না, একেবারে সোজা একভাবে জ্বলে। মন যখন চিন্তাবিমুক্ত হয়ে ওইভাবে ভগবানের পাদপদ্মে স্থিত থাকবে, তখনই সত্যি সত্যি ধ্যান হয়।

পাশ্চাত্য দেশে এখন খুব যোগচর্চা হয়। বিদেশীদের অনেকে আজকাল কথায় কথায় বলেন, 'টি.এম.' প্র্যাকটিস করছি। 'টি. এম.' মানে ট্রানসেনডেনটাল মেডিটেশন; মহাঋষি মহেশ যোগী আমেরিকাতে যে ধ্যান শেখাচ্ছেন, তার ওই নাম। ওখানকার প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন টি. এম. সেনটার আছে। ওদেশেরসমস্যার মূল কথাটা টেনশন, উত্তেজনা। এটা অবশ্য আমাদের দেশেও খুব দেখা যাচ্ছে। কথায় কথায় তাই, হৃদরোগের আক্রমণ। স্নায়ুগুলো যেন সর্বদা অশান্ত, অস্থির। ওদের দেশের লোকদের আর এক সমস্যা—অনিদ্রা। কিশোর-কিশোরীদেরও ঘুমের ওষুধ খেতে হয়। ওখানকার মানুষেরা বুদ্ধিমান, কোটি কোটি টাকা উপার্জন করে কতলোক, কিন্তু কী দুঃখের কথা, প্রায়ই ওদের মানসিক অসুস্থতা দেখা দেয়। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠিত

২। গীতা, ৬।১৯ ॥

ব্যক্তির তাই নিজস্ব সাইকিয়াট্রিসট ঠিক করা থাকে। এখন, ওরা দেখছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ধ্যানের অভ্যাস করে বেশ স্বস্তিতে আছে ; তারা রাত্রে ঘুমোয়, শরীরে-মনে বেশ সুস্থ। বাস্তবের এই ফলটা দেখে ওদেশের বহু লোক ধ্যানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। ওরা 'ধ্যান' শব্দটি ব্যবহার করছে না, বলছে 'রিল্যাকসেশন রেসপনস'। অর্থাৎ ধ্যানকে ওরা স্বাস্থ্যের উপকারিতার জন্য ব্যবহার করছে। ওরা বলতে অবশ্য ওদেশের সকলে নয়, অনেকে। নিয়মিত ধ্যানের ফলে শারীরিক সুস্থতা লাভ করা যায় বটে, তবে ধ্যানের প্রকৃত উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক উন্নতি।

যীশুখ্রীষ্টের ক্রস-এ বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর কথা আমরা জানি। মৃত্যুর পর তাঁর দেহ হঠাৎ অদৃশ্য হল। তাঁর দেহ কবর দেওয়ার পর খুব বৃষ্টিপাত হয়, বজ্রপাত হয়, তারপর দেখা যায়, মৃতদেহটি নেই। এই রেজারেকশন সম্পর্কে একটি মত—ওঁর মৃত্যু হয়নি, আসলে উনি সমাধিস্থ হয়েছিলেন, সেই অবস্থায় মৃত ভেবে তাঁকে কবর দেওয়া হয়। কবর আবার ভাল করে দেওয়া হয়নি, শুধু কোনও রকমে কিছু মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল। ওই যে মেরি ম্যাগডালিন, তিনি, আর জেমসের মাতা মেরি, তাঁরা সমাধিস্থল পাহারা দিচ্ছিলেন ; ঝড়বৃষ্টির পর তাঁরা যীশুখ্রীষ্টকে বেরিয়ে আসতে দেখেন। একটি কিংবদন্তী অনুসারে তিনি

ভারতবর্ষে, কাশ্মীরে, চলে আসেন। কাশ্মীরে একটি সমাধিস্থল এখনও দেখা যায়। বলা হয়, সেটি ঈশা অর্থাৎ যীশুখ্রীষ্টের সমাধিস্থান। আমরা যখন ছাত্র, তখন স্টুডেনটস হল-এ রেভারেনড বি. এ. নাগের একটি বক্তৃতা শুনেছিলাম। বিষয় ঃ 'ডিড ক্রাইসট কাম টু ইনডিয়া ?' তিনি বলেছিলেন, যীশুখ্রীষ্ট ভারতে এসেছিলেন। তাঁর মতে যীশুখ্রীষ্ট পুরীতে এসেছিলেন এবং এদেশের সাধুদের সঙ্গ করেছিলেন।

ধর্ম-জিজ্ঞাসা মানুষের মধ্যে রয়েছে যুগ যুগ ধরে। এই জিজ্ঞাসার সঙ্গে যুক্ত বিচিত্র অনুভূতি—যুগে যুগে, কালে কালে। এই প্রসঙ্গে উইলিয়াম জেমস এবং এমিলি ব্রনটির নাম করব। উইলিয়াম জেমসকে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের জনক বলা হয়। ইনি ছিলেন হারভারড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। উইলিয়াম জেমস স্বামীজীর 'রাজযোগ' পড়েন। পরে একখানি বই লেখেন, তার নাম ঃ 'ভ্যারায়েটিজ অব রিলিজিয়াস একসপীরিয়েনসেজ'। এই বইয়ে তিনি ধ্যানে যে অনুভূতি হয় তার বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর ভাষায় ওই অনুভূতি এই রকম ঃ

'a mystical feeling of enlargement, union and emancipation that has no specific content of its own.'

—অর্থাৎ মনে হয়, আমি ক্ষুদ্র নই, বৃহৎ হয়ে গিয়েছি। আর মনে হয়, ভগবানের সঙ্গে আমার যোগ হচ্ছে, সেই-সঙ্গে পাচ্ছি মুক্তির আস্বাদ। এই মুক্তির আস্বাদ কখন লাভ করি? না, যখন আমার মধ্যে কোনও চিত্তবৃত্তি নেই। যখন শূন্য বোধ হয়, শরীর-মনের বোধ থাকে না।

ভদ্রলোক সম্ভবত ধ্যান করতেন, না হলে কী করে এমন আশ্চর্য বর্ণনা দিলেন? এমিলি ব্রনটির একটি কবিতায় ধ্যানের একটি চমৎকার চিত্র পাওয়া যায়। সেই কবিতার কয়েকটি লাইন ঃ

'But, first, a hush of peace—a soundless calm descends;
The struggle of distress, and fierce impatience ends;
Mute music soothes my breast—unuttered harmony,
That I could never dream, till Earth was lost to me.'

—অর্থাৎ প্রথমে সব নিস্তব্ধ, নিথর, শান্ত, এতটুকু শব্দ নেই। যত ব্যথা, যন্ত্রণা, অস্থিরতা সব চলে গিয়েছে। আমি তখন শুনছি এক অবাক সংগীত; অনুচ্চারিত, স্বপ্নাতীত সেই ঐকতানে আমার হৃদয় প্রশান্ত হয়ে আসছে। এই

অবস্থায় জগৎ-সংসার সব ভুলে গিয়েছি, জগৎ থেকে তখন আমি বিযুক্ত।

লেখিকার এই রচনার সঙ্গে ধ্যান সম্পর্কে যোগশাস্ত্রের বর্ণনা মিলে যায়। কবিতাটি অপূর্ব।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে এক ভক্ত জিজ্ঞাসা করছেন, সমাধি-অবস্থায় তাঁর কী বোধ হয়। উত্তরে তিনি বলছেন ঃ **শুনেছো, কুমুরে পোকা চিন্তা করে আরশুলা কুমুরে পোকা হয়ে যায়; কি রকম জানো? যেমন হাঁড়ির মাছ গঙ্গায় ছেড়ে দিলে হয়।**

'কুমীর' শব্দ থেকে 'কুমুরে' পোকা কথা এসেছে। যদিও ছোট, চেহারায় এই পোকা কতকটা কুমীরের মতো; স্বভাবটাও হিংস্র। যার চিন্তা আমরা বেশী করি, শেষ পর্যন্ত আমরা তা-ই হয়ে যাই। গীতায় আছে, মৃত্যুর সময় আমরা যার চিন্তা করি, আমরা তা-ই হয়ে যাই। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥[৩]

—মৃত্যুকালে যে আমার চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করে, সে আমার ভাবই প্রাপ্ত হয়, এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই।

৩। গীতা, ৮।৫

কুমুরে পোকা তেলাপোকার ঘাড়ে চেপে বসে, তেলাপোকা তখন নড়তে-চড়তে পারে না, ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকে। মৃত্যু আসন্ন। এই অবস্থায় সে কুমুরে পোকার চিন্তা করতে থাকে আর ওই ভাবতে ভাবতে কুমুরে পোকা হয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে এই কথা আছে। কবি সেখানে বলছেন :

এক গোটা পতঙ্গ যখন মাত্র ধরে।
চিত করি কুম্ভরিকা তাহা দৃষ্টি করে ॥
যেরূপ দেখি মৈল সেই রূপ হৈল।
কুম্ভরিকা হৈয়া সেই পতঙ্গ উড়ি গেল ॥

সমাধি-প্রসঙ্গে কুমুরে পোকার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করে শ্রীশ্রীঠাকুর বলতে চাইছেন, ঈশ্বরের ধ্যান করতে করতে মানুষ ঈশ্বরই হয়ে যায়। 'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি'।[৪] নুনের পুতুল সমুদ্রে গিয়ে নামল আর সঙ্গে সঙ্গে গলে গেল, সমুদ্রের সঙ্গে এক হয়ে গেল—শ্রীশ্রীঠাকুরের উপমা।

সমাধির পর একটুও অহং ভাব থাকে কিনা—এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন : **হাঁ, আমার প্রায় একটু অহং থাকে।** জ্ঞানীর অহংভাব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়, ভক্তের একটু থাকে। সেটি সেব্য-সেবক ভাব। সেখানে ঈশ্বর হচ্ছেন রসস্বরূপ, আর ভক্ত রসিক। তিনি বলছেন, সোনা

৪। মুণ্ডকোপনিষদ্‌, ৩।২।৯ ॥

ঘষলেও শেষপর্যন্ত একটু থেকে যায়। অবতার-পুরুষ তো, তাই স্বেচ্ছায় একটু অহং রেখে দিয়েছেন। লোককল্যাণের জন্য। তিনি এক জায়গায় বলেছেন : ঘুঁটি যদি পেকে যায়, তবে আর খেলা হয় না। ভগবানের লীলা চলতে থাকুক, ভক্ত এটি চান। 'তুমি-আমি' থাকলে ভক্তিরসের আস্বাদন হয়। ভগবান তুমি আছ, ভক্ত আমি আছি—এইভাবে রসের আস্বাদন। আর যদি 'আমি' লুপ্ত হয়, তবে জড় সমাধি, নির্বিকল্প সমাধি। সেই অবস্থার কথা মুখে বলা যায় না। নুনের পুতুল সমুদ্রে গিয়ে যখন তদাকার প্রাপ্ত হয়, তখন সে কি সমুদ্রের খবর দিতে পারে ?

[৭. ৪. ৭৬]

[আলোচিত অংশ : **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, প্রথম ভাগ** (১৮৮৩, ২৯শে মার্চ) ; পঞ্চম খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ; পৃঃ ৮৫।]

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও নতুন সভ্যতা

কথামৃতের যে অংশ আমাদের আলোচ্য, সেখানে দেখছি, শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঘরে রয়েছেন। শ্রীম তাঁর নিজস্ব ভাষা ও ভঙ্গীতে ওই ঘরের এবং ওখানকার পরিবেশের যে বর্ণনা দিয়েছেন, সেটি প্রথমে উপস্থিত করব। এই বর্ণনার একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। এর ভিতর দিয়ে বুঝতে পারা যায়, শ্রীশ্রীঠাকুর কী উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। আমার ধারণা, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের প্রকৃত তাৎপর্য ও ঐতিহাসিক মূল্য এখনও পর্যন্ত আমরা যথাযথভাবে নিরূপণ করতে পারিনি। তাই যখন কোনও বিদেশী পণ্ডিত শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে তাৎপর্যপূর্ণ কোনও উক্তি করেন, আমরা চমকে উঠি। মনে হয়, তা-ই তো, একথা তো আমাদের মাথায় আসেনি! খুব কাছের মানুষ কিনা! নিকট জনকে এইভাবেই উপেক্ষা করা হয়ে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দীর্ঘকাল আমরা উপেক্ষা করেছি, এখনও করছি। কিন্তু যত দিন যাবে, ততই

বুঝতে পারব, তাঁর প্রতিটি কথা, প্রতিটি আচরণ, জীবনের প্রতিটি উপলব্ধির সার্থকতা কতখানি।

শ্রীম বলছেন : **আষাঢ়ের কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথি। ইংরাজী ২২শে জুলাই, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। আজ রবিবার,ভক্তেরা শ্রীশ্রীপরমহংসদেবকে দর্শন করিতে আবার আসিয়াছেন। অন্য অন্য বারে তাঁহারা প্রায় আসিতে পারেন না। রবিবারে তাঁহারা অবসর পান। অধর** [অধর সেন, যিনি ডেপুটি ম্যাজিসট্রেট ছিলেন], **রাখাল** [স্বামী ব্রহ্মানন্দ], **মাষ্টার** [মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ; মাসটার মহাশয় বা শ্রীম নামে যিনি রামকৃষ্ণভক্তমণ্ডলীর কাছে সমধিক পরিচিত] **কলিকাতা হইতে একখানি গাড়ী করিয়া বেলা একটা-দুইটার সময় কালীবাটীতে পেঁ ৗছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আহারান্তে একটু বিশ্রাম করিয়াছেন। ঘরে মণি মল্লিকাদি আরও কয়েকজন ভক্ত বসিয়া আছেন।** [আগে থেকেই কয়েকজন ভক্ত বসে ছিলেন, এই সময় শ্রীম এবং আরও কয়েকজন সেখানে এলেন।]

রাসমণির কালীবাড়ীর বৃহৎ প্রাঙ্গণের পূর্ব্বাংশে শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দির ও শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দির পশ্চিমাংশে দ্বাদশ শিবমন্দির। [রাধাকান্তের মন্দির, ভবতারিণীর মন্দির, আবার শিবমন্দির—

সমাবেশটি যেন মনে রাখি।] **সারি সারি শিবমন্দিরের ঠিক উত্তরে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের ঘর। ঘরের পশ্চিমে অর্দ্ধমণ্ডলাকার বারাণ্ডা। সেখানে তিনি দাঁড়াইয়া পশ্চিমাস্য হইয়া গঙ্গা দর্শন করিতেন। গঙ্গার পোস্তা ও বারাণ্ডার মধ্যবর্ত্তী ভূমিখণ্ডে ঠাকুরবাড়ীর পুষ্পোদ্যান। এই পুষ্পোদ্যান বহুদূর-ব্যাপী। দক্ষিণে বাগানের সীমা পর্য্যন্ত। উত্তরে পঞ্চবটী পর্য্যন্ত—যেখানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তপস্যা করিয়াছিলেন—ও পূর্ব্বে উদ্যানের দুই প্রবেশদ্বার পর্য্যন্ত। পরমহংসদেবের ঘরের কোলে দুই একটি কৃষ্ণচূড়ার গাছ** [এখন আর এ সব গাছ নেই]। **নিকটেই গন্ধরাজ, কোকিলাক্ষ**[১]**, শ্বেত ও রক্ত করবী। ঘরের দেওয়ালে ঠাকুরদের ছবি** [কিছু কিছু ছবি এখনও আছে], **তন্মধ্যে 'পিটার জলমধ্যে ডুবিতেছেন ও যীশু তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিতেছেন' সে ছবিখানিও আছে।** [এই ছবির কাহিনীটি মনে করিয়ে দিচ্ছি। পিটার এবং আরও কয়েকজন—

১। আশুতোষ দেব-কৃত অভিধানে 'কোকিলাক্ষ' শব্দের একটি অর্থ দেওয়া হয়েছে, করবী বৃক্ষ। জনৈক পুষ্প-বিশেষজ্ঞ বলেছেন, কালচে লাল রঙের এক-পাটি করবী ফুলের নাম 'কোকিলাক্ষ'। আজকাল এই ফুল বিশেষ দেখা যায় না।

এঁরা ধীবর ছিলেন—একদিন মাছ ধরতে গিয়েছেন। সন্ধ্যা হয়-হয়, হঠাৎ ঝড় উঠেছে। এই সময় তাঁরা দেখলেন, কে একজন জলের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। ওঁরা ভূত ভূত বলে চিৎকার করতে লাগলেন। সেই মূর্তি—যীশুখ্রীষ্ট—আশ্বাস দিয়ে বললেন, ভয় পেয়ো না। তিনি নিজের পরিচয় দিলেন। পিটার তখন নৌকায় ছিলেন, বললেন : প্রভু, আমি আপনার কাছে যাব। যীশুখ্রীষ্ট আসতে বললেন। পিটার নৌকা থেকে জলে নামলেন; বেশ খানিকটা জলের উপর দিয়ে হেঁটেও গেলেন। তারপর কেমন একটা ভয় হল। মনে হল, জলে উপর দিয়ে হাঁটছি, যদি ডুবে যাই! এই রকম উদ্বেগ বা অবিশ্বাসের ভাব মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ডুবে যেতে থাকলেন। ভগবান যীশুখ্রীষ্ট তখন হাত ধরে তাঁকে টেনে তুললেন।—অনুরূপ একটি গল্প শ্রীশ্রীঠাকুরও বলতেন। একজন সমুদ্র পার হবেন। বিভীষণ তাঁকে একখানি কাগজে রামমন্ত্র লিখে দিয়ে বললেন, এই কাগজ-খানি নিয়ে যাও, জলের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারবে। বিশ্বাসে ভর করে প্রথমে তিনি বেশ যাচ্ছিলেন, হঠাৎ কাগজে কী লেখা আছে, তাঁর সেটি দেখার অদম্য কৌতূহল হল। কাগজটি মেলে দেখলেন, রামনাম। তখন তাঁর মনে হল : শুধু রামনাম লেখা, তারই জোরে

জলের উপর দিয়ে হাঁটছি, এ কি সম্ভব? যেই অশ্রদ্ধা আর অবিশ্বাসের ভাব মনে এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি ডুবে গেলেন।] **আর একটি বুদ্ধদেবের প্রস্তরময় মূর্তিও আছে।** [দেখা যাচ্ছে, হিন্দু, খ্রীষ্ট এবং বৌদ্ধধর্মের প্রতীক এখানে রয়েছে। শুধু ইসলামের কোনও প্রতীক নেই। ইসলাম ধর্মের নিয়ম অনুযায়ী তা রাখাও চলে না।] **তক্তপোষের উপর তিনি উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। ভক্তেরা মেঝের উপর কেহ মাদুরে, কেহ আসনে উপবিষ্ট। সকলেই মহাপুরুষের আনন্দমূর্তি একদৃষ্টে দেখিতেছেন। ঘরের অনতি-দূরে পোস্তার পশ্চিম গা দিয়া পূতসলিলা গঙ্গা দক্ষিণবাহিনী হইয়া প্রবাহিত হইতেছিলেন। বর্ষাকালে খরস্রোতা যেন সাগরসঙ্গমে পৌঁছিবার জন্য কত ব্যস্ত। পথে কেবল একবার মহাপুরুষের ধ্যানমন্দির দর্শন-স্পর্শন করিয়া চলিয়া যাইতেছেন।**

যে কথাটি আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করতে চাইছি, তা হল এই যে, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর ঘরখানিতে রয়েছেন, সেখানে আসছেন কলকাতার সেই সময়ের শিক্ষিত ভক্তেরা—বিভিন্ন মতের, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের—আর তিনি, শ্রীশ্রীঠাকুর, একটি নতুন সভ্যতার বীজ বপন করে দিচ্ছেন। 'নতুন সভ্যতা' কেন? ভেবে দেখুন, তখন

ভারতবাসী এক বিরাট পরীক্ষা বা সঙ্কটের মুখোমুখি। ইংরাজ শাসন এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছে, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন ঘটেছে। আমরা বর্জন করেছি পুরাতন আদর্শ, পশ্চিমী সভ্যতার অনুকরণ করছি। এই প্রেক্ষিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব। যা প্রাচীন, যা সনাতন, তারই প্রতীক স্বরূপ তিনি—কলকাতার উপকণ্ঠে উপস্থিত। তখনকার পণ্ডিত-মনীষীরা, এক-একজন দিকপাল, তাঁর কথা শুনছেন। তাঁদের সামনে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রকাশ করছেন কয়েকটি সত্য. যা সাম্প্রদায়িকতার সীমার উর্ধ্বে। তিনি নিজেকে প্রচার করছেন না। বার বার বলছেন: আমি গুরু নই, কিছু নই। ভারতবর্ষের যুগযুগব্যাপী সঞ্চিত জ্ঞান আর উপ-লব্ধিরই মুখপাত্র তিনি। সেই জ্ঞান তিনি তাঁর সহজ গ্রাম্য ভাষায় পরিবেষণ করছেন। ধীরে ধীরে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের, দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে মোহ ভেঙে যাচ্ছে। তাঁর দুই-একটি উক্তি থেকে আমরা বুঝতে পারি, দরকার মতো কীভাবে তিনি আঘাত করতেন। একবার একজন বলেছেন, গীতা চমৎকার গ্রন্থ। শ্রবণমাত্র তাঁর বিদ্রূপ: ও, কোনও সাহেব বলেছে, বুঝি! এই তিরস্কার মুহূর্তে আমাদের দাসমনো-ভাব আর হীনম্মন্যতাকে চিহ্নিত করে দেয়।

সাহেবদের সম্পর্কে এখনও আমরা সম্পূর্ণ মোহমুক্ত হতে পারিনি। আজও আমরা পাশ্চাত্যের সারটিফিকেটকে অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে থাকি। স্বামীজী দুঃখ করে বলে- ছিলেন : বিদেশে গেলাম কেন? এদেশে কেউ তো আমার কথা শোনেনি! বিদেশে স্বীকৃতি পেলাম বলেই তো দেশের লোক আমার কথা মানছে। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর কলকাতার বিশিষ্ট কয়েকজন নাগরিক যখন তাঁকে মানপত্র দিতে শান্তিনিকেতনে যান, তখন তিনিও অনুরূপ ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব নতুন সভ্যতার বীজ কেমন করে বপন করলেন? দেখুন, শ্রীশ্রীঠাকুর যে চিন্তাকে তুলে ধরলেন, তা আপাত-দৃষ্টিতে ভারতীয় বটে, কিন্তু বস্তুত তা বিশেষ কোনও একটি দেশের নয়, সমগ্র মানবজাতিরই সম্পদ। আজ পৃথিবীর চেহারা এক হয়ে এসেছে, সেখানে প্রাচ্য আর প্রতীচ্যের বিশেষ ব্যবধান নেই। জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, দর্শন এখন কোনও ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ থাকে না। এদেশের মনীষীদের চিন্তা, এখানকার সংস্কৃতির তরঙ্গ পৃথিবীর অন্যত্র আলোড়ন তোলে, আবার অন্যান্য দেশের পণ্ডিত ব্যক্তিদের ধ্যান-ধারণা এবং বিভিন্ন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক সম্পদের প্রতিও আমার আকৃষ্ট হই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার কল্যাণে যে সভ্যতা রূপ নিচ্ছে, তাকে আমরা

প্রাচ্য বা প্রতীচ্য বলে আগের মতো ঠিক চিহ্নিত করতে পারি না। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে মনে হয়, এই আশ্চর্য ব্যাপারটির একটি যোগসূত্র যেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। ভারতবর্ষকে পাশ্চাত্যবাসীদের চিনিয়ে দিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি ভারতের দর্শন, সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির কথা পাশ্চাত্য দেশে প্রচার করেছেন। এক কথায় ভারতাত্মাকে প্রচার করেছেন। ধীরে ধীরে ওদেশ ভারতকে চিনল। এ ব্যাপারে স্বামীজীই পথিকৃৎ। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভূমিকা এখানে কী? তিনি আগামী কালের দ্রষ্টা ছিলেন। যে শিল্পসভ্যতা আজ পৃথিবীকে একীভূত করে দিয়েছে, তার রূপটি তিনি আগেই যেন দেখতে পেয়েছিলেন। এই যে গঙ্গা, যার পূতসলিলকে শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন ব্রহ্মবারি, সেই নদীর দিকে তাকালে দেখবেন, সেখানে কলকারখানার ময়লা, যাকে ইংরাজীতে বলে ইনডাসট্রিয়াল ওয়েসট। গঙ্গার তীরে গড়ে উঠেছে একটি শিল্পসভ্যতা, যার আভাস তিনি পেয়েছিলেন। যেন বুঝেছিলেন, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসারের ফলে যে সভ্যতা আসছে, তা আমাদের জীবনযাত্রার রূপরীতি অনেকাংশে বদলে দেবে। আমরা আর তপোবনের যুগে ফিরে যাব না, সে আর সম্ভব নয়। কিন্তু তা-ই বলে জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য—যা ভারত চিরকাল বিশ্বাস করে

এসেছে এবং ধরে রেখেছে—যেন আমরা ভুলে না যাই। তিনি তারই উপর জোর দিয়েছিলেন। উপলব্ধি করেছিলেন, যে শিল্পসভ্যতা ভারতের পুণ্যভূমিতে বিস্তৃত হতে চলেছে তা দেশের আত্মাকে ক্ষুণ্ণ করবে না, যদি দেশবাসী জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন থাকে। সেই উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরলাভ, আত্মোপলব্ধি ; নিজের বাইরে নয়, ভিতরে আনন্দের উৎস অনুসন্ধান। তাঁর এই শিক্ষা কেবলমাত্র ভারতবাসীর জন্য, এমন কথা ভাবাও ঠিক নয়। শুধু এই দেশের মানুষের জন্য নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্যই তিনি এই শিক্ষা রেখে গিয়েছেন।

বৃটিশ ঐতিহাসিক টয়েনবি বলেছেন ঃ যদি ভারতের পথ আমরা গ্রহণ করতে না পারি, তা হলে যে যান্ত্রিক সভ্যতা আমরা গড়েছি, সেটি টিকবে না। ভারতের পথ বলতে যে পথ অশোক দেখিয়ে গিয়েছেন, যে পথ শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেখিয়ে গেলেন। সংযমের পথ, ত্যাগের পথ, প্রেম-পবিত্রতার পথ। মনে করুন, উপনিষদের সেই মন্ত্র ঃ 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।'[২] আমরা ত্যাগে বিশ্বাস করি। বৃহত্তর বস্তুর জন্য ক্ষুদ্র বস্তুর ত্যাগ। ত্যাগ তাই নেতিবাচক নয়। মহত্তর, বৃহত্তর আনন্দ-অনুভূতির জন্য ক্ষুদ্র, ক্ষণিক সুখভোগ-স্পৃহা বর্জনের কথা বলা হয়েছে। যাঁকে বলি ঈশ্বর, ব্রহ্ম

২। ঈশোপনিষদ্, ১ ॥

অথবা আত্মা. তাঁকে জানা বা লাভ করা-ই হচ্ছে জীবনের উদ্দেশ্য। এই মহত্তম প্রাপ্তির জন্য বাইরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ইন্দ্রিয়-সুখ ত্যাগ করতে হবে—যা শ্রেষ্ঠ সুখ নয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর জীবনের ভিতর দিয়ে এই আদর্শকে সকলের সামনে প্রকট করে গেলেন। দেখিয়ে গেলেন, নিজের ভিতর যে সম্পদ রয়েছে সেই সম্পদ কেমন করে লাভ করতে হয়। তাঁর বাণী বিশেষ কোনও দল বা মতের কথা নয়।

গঙ্গাতীরে বসে তিনি তপস্যা করেছেন। সেখানে বিচার করেছেন ঃ টাকা মাটি, মাটি টাকা। ওই বিচারের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন ঃ আমরা যার দাসত্ব করি, সেই অর্থের প্রকৃত মূল্য মাটির চেয়ে বেশী নয়। আমাদের সাবধান করে দেবার জন্যই ওই বিচার। একবার মাইকেল মধুসূদন দত্ত দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছেন। সেখানে সাধক-পণ্ডিত নারায়ণ শাস্ত্রীজী মাইকেলকে ধর্মত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। মাইকেল জানান, তিনি পেটের দায়ে ওই কাজ করেছেন। এই কথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুরের এমন অবস্থা হল যে, তিনি সেই মুহূর্তে মাইকেলের সঙ্গে কোনও কথা বলতে পারলেন না। শ্রীশ্রীঠাকুরের তখন মনোভাব ঃ ছি, পেটের দায়ে ধর্মত্যাগ ! ধর্ম কি এমন সামান্য জিনিস যে পেটের দায়ে অথবা অর্থের জন্য তা ত্যাগ করতে হবে ?

বর্তমান সভ্যতা আবার এই অর্থেরই দাস। আমাদের কৌলীন্য নির্ধারণ করে দিচ্ছে চারিত্রিক গুণ নয়, অর্থ। সভ্যতার এই মানদণ্ডকে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রত্যাখ্যান করেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বিলাতের একটি বক্তৃতায় বলেন: তোমাদের দেশে কৌলীন্যের ভিত্তি কী? অর্থ। তোমাদের দেশে আজ যাঁরা বড় বড় লর্ড, ব্যারন ইত্যাদি, তাঁদের পূর্বপুরুষরা কী করতেন? করতেন ডাকাতি; ওঁদের অনেকে জলদস্যু ছিলেন। সেইভাবে অর্থ উপার্জন করে, রাজা বা রাণীর কৃপা ভিক্ষা করে ওঁরা অভিজাত হয়েছেন। তোমরা সব তাঁদেরই উত্তর পুরুষ। এই তোমাদের সভ্যতা। আর আমাদের সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে এই বিশ্বাসের উপর যে, মানুষের চেয়ে বড় আর কিছুই নেই। যেখানে মনুষ্যত্বের বিকাশ, ত্যাগ, পবিত্রতা, সংযম, প্রেম, এই সব, সেখানে আমাদের দেশের লোক শ্রদ্ধায় মাথা নত করে।

স্বামীজী একবার তাঁর পাশ্চাত্যবাসী কয়েকজন ভক্তকে নিয়ে দক্ষিণ ভারতে গিয়েছেন। একদিন তাঁরা পথে দেখছেন সেখানকার এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে—তাঁর খালি গা, খালি পা, মাথায় প্রকাণ্ড শিখা, গলায় উপবীত, সর্বাঙ্গে তিলক কাটা, গায়ের রঙ কালো। পাশ্চাত্য ভক্তেরা এমন মানুষ আগে কখনও দেখেননি; নিজেদের

মধ্যে বলাবলি করছেন—মানুষ, না নেকড়ে বাঘ? স্বামীজী তখন বললেন: তোমরা কাকে দেখে হাসাহাসি করছ? জান, ইনি কে? ইনি হয়তো এক অসাধারণ পণ্ডিত এবং অতুলনীয় চরিত্রের অধিকারী। তোমরা এঁর বাইরের রূপটা দেখে হাসছ, ইনি যে কত উন্নত তা তোমরা জান না; কারণ এঁর ভিতরের রূপ তো দেখতে পাচ্ছ না!

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই মানবসভ্যতা যে পথে চলেছে, সেই পথ থেকে তার মোড় ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। টয়েনবির মতো পণ্ডিত ব্যক্তির উক্তির তাৎপর্য সেইখানে। সেটি অনুধাবন করলে আমরা নতুন করে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাজীবনের সার্থকতা বুঝতে পারব। বুঝতে পারব তাঁর প্রতিটি কথা ও আচরণের অন্তর্নিহিত অর্থ।

বলছিলাম নতুন সভ্যতার কথা। দেখুন, পৃথিবীর সব সভ্যতাই গড়ে উঠেছে কোনও-না-কোনও নদীর তীরে। আমাদের আর্যসভ্যতা গড়ে উঠেছিল সিন্ধুতীরে। মিশরীয় সভ্যতা গড়ে ওঠে নীল নদীর তীরে, চীনের সভ্যতা ইয়াং সিকিয়াঙ নদীর ধারে। আর এইবার যে নতুন সভ্যতার পত্তন হতে চলেছে, তা গঙ্গার তীরে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন: এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ। ঐতিহাসিক টয়েনবিও সেই কথা বললেন। বললেন: বাঁচার তাগিদে, আত্মরক্ষার তাগিদে পৃথিবীকে ভারতের

শরণ নিতে হবে। পাশ্চাত্যবাসীদের সম্বোধন করে স্বামীজী বলেছিলেন : তোমরা একটা আগ্নেয়গিরির মুখের উপর দাঁড়িয়ে আছ ; যে-কোনও মুহূর্তে ভস্মীভূত হয়ে যেতে পার !

বস্তুত, পারমাণবিক এই যুগে বুদ্ধিমান মানুষের হাতে যে প্রচণ্ড শক্তি এসেছে, সেই শক্তির সদ্ব্যবহার যদি না করা হয়, তবে ধ্বংস অনিবার্য। সদ্ব্যবহার করতে গেলে চাই সংযম, মানবকল্যাণবোধ। সেই সঙ্গে প্রেম, মৈত্রী, ত্যাগ এইসব গুণ অর্জন করতে হবে। পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাসে দেখছি দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার। পশ্চিমী সভ্যতার বনিয়াদ গড়া হয়েছে লুণ্ঠন আর শোষণের উপর। এশিয়া আর আফরিকা পশ্চিমী শক্তির শিকার হয়েছিল। আজ আবার সেই এশিয়া-আফরিকা জেগেছে। একটি তৃতীয় জগৎ, তৃতীয় শক্তির সৃষ্টি হয়েছে। আরব জাতির হাতে এখন শক্তির একটি বিশেষ চাবিকাঠি—খনিজ তেল। আজ অনেক দেশ তাদের তোষামোদি করছে। এই অবস্থায়, প্রায় এক শতাব্দী পার হয়ে, বিজ্ঞজনেদের কানে আসছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী : সংযম অভ্যাস কর, ত্যাগ অভ্যাস কর, সকলকে আপনার করে নিতে চেষ্টা কর ; এছাড়া অন্য পথ নেই। ঐতিহাসিক টয়েনবি বুঝি সেই বাণী শুনতে পেয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন এই ত্যাগ আর প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ। একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। রানী রাসমণির জামাতা যিনি তাঁর সমস্ত জমিদারি দেখাশোনা করতেন, সেই মথুরবাবু ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের পরম অনুরাগী ভক্ত। মথুরবাবুর মৃত্যুর পর কর্তা হলেন তাঁর ছেলে ত্রৈলোক্যবাবু। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি তাঁর তেমন ভক্তিভাব ছিল না। একদা রানী রাসমণির ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র, পিতার গুরুস্থানীয় —তিনি আছেন, থাকুন, এই ভাব। এখন, একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাগনে হৃদয় ত্রৈলোক্যবাবুর বালিকা-কন্যাকে কুমারী-পূজা করে বসলেন। তাঁর অনুমতি না নিয়েই হৃদয় এই কাজ করেছেন। হৃদয় ব্রাহ্মণ, ওঁরা শূদ্র—কন্যার অকল্যাণ আশঙ্কায় ত্রৈলোক্যবাবু ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। দরোয়ানদের বললেন, বের করে দাও। দরোয়ানরা বুঝেছে, হৃদয় এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব, দুজনেরই প্রতি ওই নির্দেশ। ওরা গিয়ে সেই কথা বলেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে বলছেন : আমাকে চলে যেতে হবে ? বেশ।—এই বলে গামছাখানি কাঁধে ফেলে তখনই অম্লানবদনে ঘর থেকে বেরলেন। নির্বিকার। ত্রৈলোক্যবাবু তাঁকে যেতে দেখে তাড়াতাড়ি বললেন : এ কী, আপনি কেন যাচ্ছেন ? আপনাকে তো যেতে বলিনি। আপনি যেমন আছেন, থাকুন। শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে আবার হেসে বললেন :

তব কথামৃতম্

ও, আমাকে যেতে হবে না, বলছ? বেশ!—এই বলে আবার সহজভাবেই ফিরে এলেন।

এই একটি ঘটনা থেকেই বুঝতে পারা যায়, তিনি কী নিরভিমান, নিরহংকার, সরল, ত্যাগী পুরুষ ছিলেন। ত্যাগ আর প্রেমের মূর্ত প্রকাশ যে তিনি!

[২১. ৪. ৭৬]

[আলোচিত অংশ: **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, প্রথম ভাগ** (১৮৮৩, ২২শে জুলাই); ষষ্ঠ খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ; পৃঃ ৮৭।]

'জগৎ মিথ্যা'

আজকের আলোচ্য অংশে আমরা দেখছি, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে কয়েকজন ভক্ত বসে আছেন। তাঁদের একজন মণি মল্লিক—পুরাতন ব্রাহ্ম ভক্ত। তিনি কাশী গিয়েছিলেন, সেখান থেকে ফিরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে কাশীর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। বলছেন: কাশীতে দেখলাম আর এক সাধুকে। ইতিপূর্বে তিনি হয়তো আরও কয়েকজন সাধুর কথা বলেছেন, এখন অন্য এক বিশেষ সাধুর কথা তুলেছেন। এই সাধুর উপদেশ: শুধু ঈশ্বর ঈশ্বর করলে হবে না, ইন্দ্রিয় সংযম করতে হবে। শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে এঁদের মত বুঝিয়ে দিচ্ছেন:

এদের মত কি জান? আগে সাধন চাই। শম, দম, তিতিক্ষা চাই এরা নির্বাণের চেষ্টা ক'রছে। এরা বেদান্তবাদী, কেবল বিচার করে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। তার পর তিনি বলছেন: **বড় কঠিন পথ। জগৎ মিথ্যা হ'লে তুমিও মিথ্যা, যিনি ব'লছেন তিনিও মিথ্যা, তাঁর কথাও স্বপ্নবৎ। বড় দূরের কথা। কি রকম জান? যেমন কর্পূর পোড়ালে কিছুই বাকী থাকে না। কাঠ পোড়ালে**

তবু ছাই বাকী থাকে। শেষ বিচারের পর সমাধি হয়। তখন 'আমি' 'তুমি' 'জগৎ' এসবের খবর থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এখানে বেদান্তের পথ অর্থাৎ জ্ঞানমার্গকে নিন্দা করছেন না। শুধু বলতে চাইছেন যে, জ্ঞানবিচারের পথ অতি কঠিন। সাধারণ মানুষের পক্ষে ভক্তির পথ সহজ, সুগম। এ কথা তিনি অনেক জায়গায় বলেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রধানত ভক্ত ছিলেন, না জ্ঞানী ছিলেন—এ নিয়ে একটা বড় বিতর্ক আছে। কথামৃতের পাঠক বলতে পারেন, তিনি তো ভক্তই ছিলেন, ভক্তির কথাই তো বার বার বলেছেন। ম্যাকসমুলারেরও ধারণা তা-ই ছিল। তিনি এক জায়গায় বলেছেন: রামকৃষ্ণের চেলারা তাঁকে বড় করবার জন্য প্রমাণ করবার চেষ্টা করছেন যে, তিনি বেদান্তবাদী, জ্ঞানমার্গী ছিলেন। এ কথা ঠিক নয়; রামকৃষ্ণ আসলে ভক্ত ছিলেন, ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বলছি যা থেকে আপনারা বুঝে নিতে পারবেন, তিনি কী ছিলেন। হিমালয়ে, আলমোড়া থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে, মায়াবতী বলে একটি জায়গা আছে। স্বামীজী যখন ইউরোপে ছিলেন সেখানে আলপস পাহাড়ে খ্রীষ্টানদের একটি মঠ দেখে তাঁর

খুব ভাল লাগে। হিমালয়ে ওই রকম একটি মঠ স্থাপিত হোক, তাঁর এই ইচ্ছা হয়েছিল। ঘটনাক্রমে পরে মায়াবতীতে আশ্রম নির্মিত হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ছয় হাজার আটশো ফুট উঁচুতে, আশ্রমের মনোরম জায়গাটি স্বামীজীকে কিনে দেন তাঁরই এক ইংরাজ শিষ্য—ক্যাপটেন সেভিয়ার। স্বামীজীর নির্দেশ ছিল, এই আশ্রমে যেন মূর্তিপূজা তথা দ্বৈত সাধনার অনুষ্ঠান না হয়। মায়াবতী আশ্রমকে তিনি সম্পূর্ণরূপে অদ্বৈত সাধনার কেন্দ্র হিসাবে দেখতে চেয়েছিলেন। আশ্রম নির্মিত হবার পর কিন্তু সাধুদের মধ্যে কয়েকজনের উদ্যোগে সেখানে একটি আলাদা ঠাকুরঘর করা হয়, সেই ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি ছবি রাখা হয়। ঠাকুরের ছবির কাছে ফুল, ধূপ-ধুনা ইত্যাদিও দেওয়া হতে থাকে। স্বামীজী দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য দেশ থেকে ফিরে ক্যাপটেন সেভিয়ারের মৃত্যু-সংবাদ পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন মায়াবতী—মিসেস সেভিয়ারকে (তাঁকে স্বামীজী 'মা' বলতেন) সান্ত্বনা দেবার জন্য। সেই সঙ্গে আশ্রমটিও দেখে আসার ইচ্ছা। মায়াবতী আশ্রমে ওই ঠাকুরঘর দেখে স্বামীজী অসন্তুষ্ট হলেন এবং নানাভাবে বিরক্তি প্রকাশ করলেন। আশ্রমের সাধুরা স্বামীজীর মনোভাব বুঝে অবিলম্বে ঠাকুর-ঘর তুলে দিলেন বটে, কিন্তু একজনের মনে এ ব্যাপারে

একটু সংশয় থেকে গেল। শ্রীশ্রীমাকে সব কথা জানিয়ে তিনি লিখলেন : স্বামীজীর ইচ্ছা অনুযায়ী আমরা ঠাকুরের ছবি সরিয়েছি, কিন্তু মনে বড় দুঃখ পেয়েছি। এখন, এ বিষয়ে আপনি কী বলেন জানতে চাই। মা, আপনি বিচার করুন। চিঠির উত্তরে শ্রীশ্রীমা জানালেন : নরেন যা করেছে, ঠিকই করেছে। ঠাকুর অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তোমরাও অদ্বৈতবাদী।

দেখুন, একটি কঠিন প্রশ্নের সমাধান কত সহজে অথচ স্পষ্টভাবে করে দিলেন শ্রীশ্রীমা—সাধারণ দৃষ্টিতে গ্রাম্য, প্রায়-নিরক্ষরা এক মহিলা! দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিলেন : ঠাকুর অদ্বৈতবাদী ছিলেন। এর পর আর কোনও তর্ক থাকতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষত্ব এই যে, তিনি দ্বৈত আর অদ্বৈত, এই দুইয়ের মধ্যে কোনও বিরোধ দেখেননি; তিনি এই দুইয়ের সমন্বয় করেছেন। শ্রীমৎ তোতাপুরী শক্তি মানতেন না, তিনি ছিলেন উগ্র অদ্বৈতবাদী। ঠাকুর একদিন সন্ধ্যায় হাততালি দিয়ে মায়ের নাম করছেন, তাই দেখে তোতাপুরীজী বললেন : কী করছ, রুটি বানাচ্ছ কেন? (কেঁও রোটি ঠোকতে হো?) যিনি এইভাবে সেদিন বিদ্রূপ করলেন, অদ্বৈতবাদী সেই সাধকই

আবার পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রভাবে মাকে মানলেন, শক্তি মানলেন। কালীমন্দিরে প্রণাম করে তবে তিনি দক্ষিণেশ্বর থেকে বিদায় নিয়েছিলেন।

দ্বৈতবাদ আর অদ্বৈতবাদের মধ্যে আমরা তর্ক দেখি; জ্ঞান আর কর্মের মধ্যে বিবাদ দেখি; জ্ঞান আর ভক্তির মধ্যে বৈষম্য দেখি। শ্রীশ্রীঠাকুর এ সবের সমন্বয় করেছেন। দেখিয়েছেন, এ সবেরই একটা স্থান আছে। সেইসঙ্গে বলেছেন : যে কোনও প্রকারে হোক, লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। লক্ষ্য ভগবান লাভ।

বেদান্তবাদীরা সাধন প্রসঙ্গে ষট্ সম্পদের কথা বলেন। ষট্ সম্পদ হল : শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা। এগুলি সত্যিই সম্পদ। 'শম'—যা থেকে 'শান্তি' শব্দটি এসেছে—মানে চিত্তের স্থিরতা। অনেকে স্বভাবত অস্থির। আবার কারও ক্ষেত্রে চিত্তের স্থিরতা স্বাভাবিক। তিনি 'শম' গুণের অধিকারী। 'দম' হচ্ছে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ। সুখাদ্য দেখলে সাধারণত জিভে জল আসে; কিন্তু যাঁদের 'দম' গুণ আছে, তাঁরা ইন্দ্রিয়কে আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারেন। 'উপরতি' বা 'উপরম' বলতে বাসনা-ত্যাগ। 'উপরতি' গুণের অধিকারী হলে 'এটা চাই, ওটা চাই' এই রকম ইচ্ছার উদয় হবে না। 'তিতিক্ষা' শব্দের অর্থ সহিষ্ণুতা। আমরা সচরাচর গরমে

কষ্ট পাই, আবার শীতেও কাতর হয়ে পড়ি ; কিছুই অনায়াসে সহ্য করতে পারি না। তিতিক্ষাগুণসম্পন্ন সাধকের কষ্টবোধ থাকে না ; শারীরিক কষ্ট সম্পর্কে তিনি উদাসীন। খ্রীষ্টান সাধকেরা এক সময়ে মরুভূমিতে গিয়ে শরীরের উপর নির্যাতন করতেন। ধরুন, মনে একটা কুচিন্তা এল, সঙ্গে সঙ্গে চামড়ার চাবুক দিয়ে তাঁরা নিজেদের শরীরে আঘাত করতেন। তাঁদের কষ্টসহিষ্ণুতার অভ্যাসের সঙ্গে যুক্ত থাকতে আত্মনির্যাতন। তিতিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য অবশ্য তা নয়। শাস্ত্রবাক্য শ্রবণে মনঃসংযোগকে 'সমাধান' এবং গুরুমুখে শ্রুত বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস স্থাপনকে 'শ্রদ্ধা' বলা হয়।

এই ছয়টি গুণকে এক কথায় সংযম বলা যায়। ষট্‌সম্পদের অভ্যাস খুবই ভাল। এগুলি ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ। যাঁরা ভক্ত, তাঁদের অনায়াসে এই সব অভ্যাস হয়ে যায়। জ্ঞানীদের যেতে হয় কঠিন বিচারের পথে। তাঁদের বিচারের শুরুতে প্রশ্ন : আমি কে অথবা কী ? আমি কি এই রক্তমাংসের শরীর ? আমি কি মন ? বুদ্ধি ? শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন : প্যাঁজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে শেষকালে দেখা যায়, কিছুই থাকে না। এই বিচারেও একটা একটা করে বর্জন করতে হয়। দেখা যায়, আমি দেহ নই, মন নই, বুদ্ধিও না। অবশেষে

সিদ্ধান্ত : আমি সেই আত্মা বা ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। নির্বাণষট্‌কমে আছে :

ওঁ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং
ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ু—
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥[১]

—অর্থাৎ আমি মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত এসব কিছুই না ; পঞ্চেন্দ্রিয় এবং পঞ্চভূতেরও একটিও না। আমি চিদানন্দরূপ, সচ্চিদানন্দস্বরূপ শিব।

সেই পেঁয়াজের খোসা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে শেষে ওই সত্যে উপনীত হওয়া—আমি ব্রহ্ম। সত্য কাকে বলা হয় ? যা নিত্য, তা-ই সত্য। যা অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। তিন কালে অবাধিত। এই জগৎ সত্য নয়, কারণ তা পরিবর্তনশীল। 'জগৎ' শব্দটি ব্যুৎপন্ন হয়েছে গম্ ধাতু থেকে ; 'সংসার' শব্দ এসেছে সৃ ধাতু থেকে—দুয়েরই অর্থ, যা চলছে, সরছে। নিত্যবস্তু সর্বদা সমান, সনাতন, অবিকারী। ঈশ্বর বা ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই সব বিশেষণ ব্যবহৃত হয়।

বেদান্তবিচারে তাই জগৎ মিথ্যা। বেদান্তবাদীরা বলেন : জাগতিক অভিজ্ঞতা স্বপ্নদর্শনের মতো। সংসারকে

---

১ স্তবকুসুমাঞ্জলি (নির্বাণষট্‌কম্), পৃঃ ৩৯৪ ।

তাঁরা মায়া-মরীচিকার সঙ্গে তুলনা করেন। এই মায়া-মরীচিকাকে আবার তাঁরা বলেন 'রজতশুক্তিবৎ'। ব্যাপারটা এইরকম ঃ ধরুন, এক জায়গায় আলো-অন্ধকার মিশে আছে, সেখানে রয়েছে শুক্তি অর্থাৎ ঝিনুক ; দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে যেন রুপো—আপনি তার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। এই ধরনের আরও উদাহরণ দেওয়া হয়। যেমন, 'রজ্জুসর্পবৎ' ; রজ্জু অর্থাৎ দড়ি থেকে সর্প ভ্রম হচ্ছে। এই সব জায়গায় শুক্তি অর্থাৎ ঝিনুক এবং রজ্জু অর্থাৎ দড়ির জ্ঞান আবৃত হয়ে যায় এবং তার বদলে আমরা দেখি রজত বা রুপো এবং সর্প বা সাপ। প্রথম হয় আবরণ, তার পর আসে বিক্ষেপ অর্থাৎ অন্যরূপে জ্ঞান। মূল অধিষ্ঠান বা আশ্রয় ঢাকা পড়ে যায়। তেমনই ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠান আবৃত হয়ে গিয়ে এই জগৎরূপ ভ্রমকে দেখায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন ঃ এই জ্ঞান বিচারের পথ বড় কঠিন। 'কথামৃত' বইয়ে কৃষ্ণকিশোর নামে এক বেদান্তবাদীর উল্লেখ আছে। তিনি নিজেকে আকাশবৎ বলতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখেন, তিনি বিমর্ষ। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, তাঁর খাজনা বাকি পড়েছে ; লোক এসে বলে গিয়েছে, টাকা না দিলে ঘটি-বাটি নিয়ে যাবে। শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে বলেন, তুমি তো 'খ' (আকাশ) গো, তোমার এতে কী আসে যায় !

জীবনে পরীক্ষার সময় বেদান্ত-বিচার যদি কাজে না লাগে, যদি তা ব্যর্থ হয়, তবে সেই বিচার করে কী লাভ ? তাই শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন, এ বড় কঠিন পথ।

কাশীর সাধুর কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলছেন ঃ এরা নির্বাণের চেষ্টা করছে। 'নির্বাণ' শব্দটির সহজ অর্থ মুক্তি। নির্ পূর্বক 'বা' ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করলে 'নির্বাণ' শব্দটি পাওয়া যায়। প্রদীপ জ্বলছে, সেটি নিবে গেল—এই হল নির্বাণ। হিন্দু দর্শনে 'মুক্তি' বা 'মোক্ষ' শব্দের ব্যবহার আছে ; জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার অর্থে 'মুক্তি' বা 'মোক্ষ' শব্দ প্রযুক্ত হয়। বুদ্ধদেব প্রচলিত ওই দুই শব্দের কোনটি গ্রহণ করেননি ; তিনি অনেক চিন্তা করে গ্রহণ করেছেন 'নির্বাণ' শব্দটি। তিনি বলছেন ঃ আমাদের যত সংস্কার আছে সেসব পুড়িয়ে ফেল। কেমন করে পোড়াতে হবে, তা-ও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। জ্বলন্ত আগুনে যদি ইন্ধন যোগ না করা হয়, তবে সে আগুন ক্রমে স্বতঃ নিবে যায়। আমাদের মনে যে বাসনা, আকাঙ্ক্ষা আছে সেগুলিকে দূর করতে হবে। বাসনা-আকাঙ্ক্ষাকে বলা হচ্ছে 'তৃষ্ণা'—পালি ভাষায় 'তণ্হা'। বাসনার বীজকে দগ্ধ করতে হবে ; তা হলে নতুন কোনও বাসনার উদ্ভব সম্ভব হবে না। শ্রীশ্রীমা একটি উপদেশে বলেছেন, ভগবানের কাছে নির্বাসনা করে দেবার জন্য প্রার্থনা করতে হয়। বুদ্ধদেবও ওই

বিবৃতির অর্থাৎ বাসনা-বিনাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন: অশ্বত্থ গাছ কেটে ফেললেও কোথা থেকে আবার ফেকড়ি বেরয়! বাসনার হাত থেকে রেহাই পাওয়া বড় কঠিন। বুদ্ধদেব তাই বাসনাকে সমূলে বিনষ্ট করতে বলছেন। বাসনার বীজ যদি বিলুপ্ত হয়, তা হলে বাসনা-রূপ আগুনের ইন্ধনও আর থাকে না, সে আগুন তখন সহজেই নিবে যায়।

বুদ্ধদেব শূন্যতারকথা বলেছেন। নির্বাণ হচ্ছে পুনর্জন্ম-নিবর্তক; সেখানে সংস্কারসমূহের ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। নাগার্জুনের একটা কথা আছে: নির্বাণকালে বোচ্ছেদঃ প্রসঙ্গাদ্ভবসন্ততঃ—জন্ম-জন্মান্তর এই ব্যাপারটির উচ্ছেদ-সাধন করতে হবে। আমার ও সংসারের চরম ধ্বংস, শূন্যতা—এইটি হচ্ছে নির্বাণ। গীতায় আছে:

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥[২]

—আগুনে একটা কাঠ দেওয়া হলে সেটি পুড়ে যায়, পড়ে থাকে শুধু ছাই। ঠিক এই রকম জ্ঞানের আগুন দিয়ে সব কর্ম ভস্মীভূত করে ফেলতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এক জায়গায় বলছেন: গাছ থেকে ফল, ফল থেকে বীজ, আবার বীজ থেকে গাছ—এই ধারা

২। গীতা, ৪।৩৭ ॥

চলছে। এখন, যদি বীজগুলি পুড়িয়ে ফেলা যায়, তবে আর তা থেকে গাছ জন্মাতে পারে না। জ্ঞানাগ্নি দিয়ে বাসনাকে সেই রকম নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হয়। জ্ঞান কখন হয়? যখন জানব আমি কে, কী আমার স্বরূপ। অর্থাৎ জানব: আমি আত্মা, ব্রহ্ম। তখন আর কোনও বাসনা থাকে না। তখন নির্বাণ লাভ করব।

জ্ঞান লাভ না হওয়া পর্যন্ত কোন্ দিক দিয়ে ঘুরে ফিরে যে বাসনা উপস্থিত হয় তা বলা যায় না। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই 'এক কৌপীন-কা ওয়াস্তে'র গল্পের মতো। এক বৈরাগ্যবান সাধু ছিলেন, সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি থাকতেন এক কুঁড়ে ঘরে। সেখানে হঠাৎ ইঁদুরের উৎপাত আরম্ভ হল। সাধুর একমাত্র পার্থিব বস্তু কৌপীন—ইঁদুরে সেই কৌপীন কেটে দিতে থাকল। বিপন্ন সাধু প্রতিকারের জন্য একজনের পরামর্শে একটি বিড়াল পুষলেন। বিড়ালের জন্য দুধ চাই। সাধু আবার অন্যের পরামর্শ অনুযায়ী দুধের জন্য গরু পুষলেন। গরু রাখতে হলে তার নিয়মিত খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হয়, জায়গা-জমিরও দরকার হয়। সাধুকে এবার জায়গা-জমি কিনতে হল। অনেক দিন বাদে সেই সাধুর গুরু সেখানে উপস্থিত হয়ে ওইসব দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কী? সাধু তখন সখেদে বলেছিলেন, এই সব কাণ্ড হয়েছে 'এক

কৌপীন-কা ওয়াস্তে', অর্থাৎ কেবলমাত্র একটি কৌপীনের জন্য !

বাসনা-দমন প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর একটি সুন্দর উপমা দিয়েছেন। সে শাস্ত্রেরই কথা। তিনি বলছেন : দেখ, কাদামাখা হাতিকে ধুইয়ে যদি ছেড়ে দাও তো, সে আবার ধুলোকাদায় গড়াগড়ি দেবে। কিন্তু যদি তাকে পরিষ্কার করে আস্তাবলে জোর করে ঢুকিয়ে দিতে পার, তবে আর সে নিজেকে নোংরা করতে পারবে না। আমাদের এই মন যেন মত্ত করী—খ্যাপা হাতি—তাকে দমন করে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে হয়। নয়তো সে যে কী করবে তার স্থিরতা নেই। ভাগবতে আছে :

কচিন্নিবর্ত্ততেঽভদ্রাৎ কচাচরতি তৎপুনঃ।
প্রায়শ্চিত্তমথোঽপার্থং মন্যে কুঞ্জরশৌচবৎ ॥[৩]

—অর্থাৎ আমাদের মন কখনও-কখনও বেশ শুদ্ধ ; যা পাপ-মলিন, তা থেকে সে তখন দূরে থাকে। আবার পরক্ষণেই সেই মন মলিন অবস্থায় ফিরে যায়। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কতবার করব ? করেই বা কী লাভ হবে ? কারণ প্রায়শ্চিত্তের ফল হাতির শুচিতালাভের মতো ক্ষণস্থায়ী।

আমাদের মন শ্রীশ্রীঠাকুর-বর্ণিত মাছির মতো—যা

৩। শ্রীমদ্ভাগবতম, ৬।১।৯ ॥

এই সন্দেশে বসছে. পরমুহূর্তে হয়তো বসছে বিষ্ঠায়। মনকে তাই দমন করা ছাড়া উপায় নেই। গীতায় আছে :

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥[৪]

—এই মন অত্যন্ত চঞ্চল এবং দৃঢ়বলসম্পন্ন। যেমন বাতাসকে কেউ শাসন করতে পারে না, মনকে তেমনই আয়ত্তের মধ্যে আনা অতি কঠিন কর্ম।

আমাদের শাস্ত্রে তাই কখনও বায়ু, কখনও মত্ত করীর সঙ্গে দুর্দমনীয় মনের তুলনা করা হয়েছে। জগদ্ধাত্রী মূর্তিতে দেখবেন, হাতির মাথার উপর সিংহ চেপে রয়েছে। যেন দেবীর বাহন ওই মত্ত করীকে দমন করে রেখেছে।

সদসৎ বিচার করে মনকে বশে আনতে হয়। কাজটি সহজ নয়। ভক্তির পথ অন্য রকম। ভক্ত অত জ্ঞান-বিচার করেন না। তিনি ভগবানের উপর নির্ভর করে থাকেন। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের গানে আছে :

আমায় দে মা পাগল ক'রে (ব্রহ্মময়ী)।
আর কাজ নাই মা জ্ঞান বিচারে ॥
তোমার প্রেমের সুরা পানে কর মাতোয়ারা.
ওমা ভক্তিচিত্তহরা ডুবাও প্রেমসাগরে ॥

ভক্ত বলেন : আমি জ্ঞানবিচার করতে পারব না। আমি

৪। গীতা, ৬।৩৪ ॥

শুধু 'মা' 'মা' বলে ডাকব, আর কিছু পারব না। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন ঃ বিড়ালছানা শুধু মিউ মিউ করে, অর্থাৎ 'মা' 'মা' ডাক ছাড়ে। তার মার উপর সে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। মা কখনও ছানাটিকে বাবুর বিছানার উপর রাখছে, কখনও বা ছাইয়ের গাদার উপর। সে নির্বিকার। সে জেনে রেখেছে, তার ভালমন্দ মা বুঝবে। ঈশ্বরের উপর ভক্তের নির্ভরতা এই রকম।

ভক্ত জানেন, তিনি যতই ভগবানের দিকে এগিয়ে যাবেন, বিষয়বাসনা ততই পিছনে পড়ে থাকবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা ঃ পূর্ব দিকে তুমি যতই এগিয়ে যাবে, পশ্চিম ততই পিছিয়ে পড়বে। একটি গানে আছে ঃ

কত ঢেউ উঠছে রে দিল-দরিয়ায়
ঢেউ দেখে বুক শুকিয়ে উঠে, না হেরি কোন উপায় ॥
মন মাঝি আনাড়ি, রিপু ছয় জনা দাঁড়ি,
তারা কেউ শুনে না আমার কথা দায় হল ভারি,
এরা ইচ্ছামত কর্ম্ম করে, (বুঝি) মাঝ গাঙ্গে তরী ডুবায় ॥
প্রেমিক বলে এই বেলা, হরিনামের ভেলা,
রাখনা কাছে, ভয় কি তুফান হলই বা মেলা,
যখন ডুববে তরী ভেলায় চড়ি, (ও ভাই) কূল পাবি হরির কৃপায় ॥

—বাসনা-তরঙ্গের মধ্য দিয়ে তরীখানি বাইতে মন-মাঝি হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে ; ছয় রিপু-রূপ দাঁড়িরা বুঝি এই তরীকে মাঝনদীতে ডুবিয়ে দেবে—এই অবস্থাতে বিপদ-তারণ হরিনামের ভেলা। ভক্তপ্রেমিক বলছেন ঃ এই ভেলাটি থাকলে আর ভয় নেই। সে ঠিক কূলে পৌঁছিয়ে দেবে। কূলে অর্থাৎ ভগবানের কাছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন ঃ আম খেতে এসেছ, আম খেয়ে যাও। বাগানে কত গাছ আছে, কত আম হয়েছে, তার দাম কত—এত খবরে তোমার কাজ কী ? ভক্তেরও সেই রকম দার্শনিক বিচারের দরকার হয় না। গীতায় শ্রীভগবান বলছেন ঃ

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥[৫]

—যোগী সদাসর্বদা ঈশ্বরের পাদপদ্মে চিত্ত সমাহিত করে নির্বাণরূপ পরম শান্তি লাভ করেন। সেই নির্বাণ আমার স্বরূপভূত।

ভক্ত শুধু ভগবানকেই চান, মুক্তিও চান না। ভগবানকে তিনি শুধু বলেন ঃ আমাকে তোমার কাছে টেনে নাও। ঈশ্বর-সান্নিধ্যই তাঁর নির্বাণ, তাঁর পরম শান্তি। ভাগবতে ভগবানকে বলা হয়েছে ভক্তবৎসল।

৫। গীতা, ৬।১৫ ॥

ভক্তবৎসলঃ স্বয়মেব সর্ব্বেভ্যো মোক্ষবিঘ্নেভ্যো ভক্তিনিষ্ঠান্ সর্ব্বান্ পরিপালয়তি। সর্ব্বাভীষ্টান্ প্রযচ্ছতি মোক্ষং দাপয়তি ॥[৬]

—ভক্তবৎসল ভগবান নিজে এসে মুক্তির সব বাধা দূর করে দেন, ভক্তকে সর্বতোভাবে পালন করেন, ভক্তের মনের সব অভিলাষ পূর্ণ করেন, মুক্তিও দেন তাঁকে। ভক্তের বোঝা বহন করে ভগবান আনন্দ পান। রামপ্রসাদ বেড়া বাঁধছেন, মা কন্যার রূপ ধারণ করে বেড়া বাঁধার দড়ি এগিয়ে দিচ্ছেন। এই রকম নানা উপাখ্যান আমরা দেখি।

রাগানুগামার্গে তারে ভজে যেই জন।
সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥[৭]

—রাগ-অনুরাগ দিয়ে যে তাঁকে ভজনা করে সে ব্রজেন্দ্রনন্দন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করে। চাই প্রকৃত অনুরাগ। তুলসীদাস বলেছেন ঃ

ব্রহ্ম নহী, মায়া নহী, নহী জীব, নহী কাল।
অপনী হু সুধি না রহী, রহেঁা এক নন্দলাল ॥

—অর্থাৎ ব্রহ্ম বুঝি না, মায়া বুঝি না, জীবও বুঝি না—এসব বেদান্তের ভাষা বুঝি না। কাল বা সময় বুঝি না, বুঝি না নিজেকেও—আমার কাছে নিজেরও কোনও

৬। ত্রিপাদ বিভূতি উপনিষদ, ৮ অঃ ॥
৭। চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ৮ ॥

অস্তিত্ব নেই। আমার আছেন শুধু নন্দলাল, আমি কেবল তাঁকেই জানি।

এই অবস্থাকে বলে তদ্গতচিত্ত। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তাঁকে ভালবাসা। এই ভালবাসা থাকলে আর ভাবনা থাকে না। শ্রীশ্রীমা বলেছেন ঃ আমি তোমাদের পাতানো মা নই, সত্যিকার মা। এই রকম আপনার ভাবেই তাঁকে দেখতে হয়। ভগবানকে আপনজনের মতো ভালবাসতে পারলে সাধনপথে বাধাবিঘ্ন থাকে না। শ্রীশ্রীঠাকুর রিপুদের মোড় ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন। কাম, ক্রোধ এই সব রিপু বিচার করে দমন করা যায়। সে একটা পথ। কিন্তু কেউ যদি ভগবানকে ভালবাসতে পারে, তবে নিজে থেকেই এসব বাধা দূর হয়ে যাবে। তিনি নিজে জোর দিয়ে একথা বলেছেন। শরীরের কোথাও ঘা হয়েছে ; এখন, রোজ যদি সেই ক্ষতস্থানের ছাল তোলা যায় তবে ঘা সহজে শুকোতে চায় না। কিন্তু যদি তা নাড়াচাড়া না করা হয়, তবে কিছুদিন পরে সেখানে মামড়ি আপনি শুকিয়ে পড়ে যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন ঃ তুমি ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা রাখ, তোমার মনের সব মলিনতা আপনি দূর হয়ে যাবে। তাঁকে ডাকলে তিনিই সব করে দেবেন। কত রকম উদাহরণ দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর কথাটা বোঝাচ্ছেন! বলছেন ঃ সূর্যোদয় হলে অন্ধকার

আপনি দূর হয়। ঈশ্বর আলোকের উৎস ; হৃদয়ে তিনি অধিষ্ঠিত হলে অন্ধকারের বা মলিনতার কোনও জায়গা থাকেনা। তাঁকে ভালবাসলে তিনি হৃদয়ে আবির্ভূত হন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজে সব পথ দিয়ে সাধন করেছেন। জ্ঞানবিচারের পথে, ভক্তির পথেও। যে বাহন নিয়ে তিনি এসেছিলেন, সকল পথে ছিল তার অনায়াস যাতায়াত। কিন্তু সব সময় তিনি বলতেন ঃ যার পেটে যা সয়। অর্থাৎ যার পক্ষে যা সহজ এবং স্বাভাবিক, সে যেন সেই পথ অনুসরণ করে এবং স্বধর্মে স্থিত থাকে। আমরা যে মতে, যে পথে আছি, সেই মতে আর সেই পথেই তিনি আমাদের এগিয়ে দিতে চেয়েছেন, তদনুযায়ী উপদেশ দিয়েছেন। এই তাঁর বিশেষত্ব। তিনি যা কিছু বলেছেন, তার কোনটা মনগড়া কথা নয়। তাঁর নিজস্ব উপলব্ধি সকল শিক্ষার মূলে। আবার তাঁর প্রতিটি উপদেশে রয়েছে শাস্ত্রের সমর্থন। এই দুটি জিনিসই বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মতো।

[২৮. ৪. ৭৬]

[আলোচিত অংশ ঃ **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, প্রথম ভাগ** (১৮৮৩, ২২শে জুলাই) ; ষষ্ঠ খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ ; পৃঃ ৮৮।]

—০—
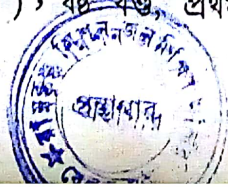
একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণামূলক গ্রন্থ

॥ চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ ॥

তথ্যানুসন্ধানী গবেষকের দৃষ্টিতে বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, মেরী লুই বার্ক, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ডঃ প্রণব-রঞ্জন ঘোষ, ডঃ অমলেন্দু বসু, ডঃ শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, প্রব্রাজিকা মুক্তি-প্রাণা, স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ প্রমুখ উনত্রিশজন কৃতী ও খ্যাতিমান লেখক। গ্রন্থটি প্রস্তুতির পথে।

প্রকাশক ঃ

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার

গোলপার্ক, কলিকাতা-২৯